মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল
এক
ফোঁটা
সুখ

এক ফোঁটা সুখ

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

- বলো মা কবুল!
কাজি সাহেবের কথায় কি রাবেয়া কবুল বলবে? কিছু একটা তো করতে হবে তাকে। চুপ করে বসে থাকলে তো হবে না।

আগে যা ঘটেছিলঃ
রাবেয়া-রা দুই বোন। বড় বোন রাজিয়ার অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। রাজিয়ার ভালো ঘড়েই বিয়ে হয়েছে। জামাই এমবিবিএস ডাক্তার। এখন শুধু রাবেয়ার বাকি। তাকে নিয়ে বাবা-মায়ের নতুন করে আবার চিন্তা আরাম্ব হল। রাবেয়াকে ভালো ঘড়ে বিবাহ দিতে পারলেই এখন তাদের রক্ষা। সবকিছু ভালোই চলছিল। কিন্তু বিপত্তি হল একদিন। রাবেয়ার মা জামিলা বেগম বিকালবেলা পাকের ঘড়ে রান্না চড়িয়েছেন। ভাত চুলায় বসিয়ে পাশের খড়ির মাঁচা থেকে কয়েকটা কাঠের টুকড়া বের করার জন্য হাত দিয়েছেন। আর ঠিক তখনি খড়ির মাঁচার উপর চুপ করে বসে থাকা একটা মোটাসোটা সাপ হাতের মধ্যে কামড় দিয়ে বসে। হাতের মধ্যে একধরনের ব্যাথা অনুভুত হল। অন্ধকার খড়ির মাঁচার সেই সাপটি জামিলার নজরেই পড়ল না।

ভাত রান্না শেষ। পাকের ঘড়টা তাদের মূল ঘড় থেকে একটু দূরে। তাই জামিলা তার ছোট মেয়ে রাবেয়াকে ডাক দিয়ে বললেন,
- রাবেয়া! তরকারির পাতিল আর মসলার ঝুড়িটা নিয়ে আয় তো!
রাবেয়া সেগুলো ঘড় থেকে নিয়ে আসল। এসেই যখন সেগুলো মায়ের হাতে দিল তখন রাবেয়া তার মায়ের হাতের আংগুলের দিকে তাকিয়ে বলল, আম্মা! তোমার হাত কাটল কিভাবে?
- আর বলিস না। খড়ির মধ্যে লোহা আছিল হয়তো। তাই হাতটা কেঁটে গেল।
রাবেয়া আরো কাছে গিয়ে তার মায়ের হাতটা ভালোভাবে খুটিয়ে দেখে বলল, কেটেছে তা ঠিক। তা কাঁটা জায়গার আশেপাশে এমন কালো হয়ে ফুলে যাচ্ছে কেন আম্মা?
- কিজানি রে। ও নিয়ে তোর ভাবতে হবে না। এমন তো মাঝে মাঝেই হয়।

এই কথাটা শুনে রাবেয়া আর কথা আগাল না। মায়ের কাছে পাতিল আর ঝুড়ি রেখে আবার ঘড়ে চলে আসল।
এদিকে জামিলার অবস্থা আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যাচ্ছে। প্রচন্ড মাথার ঝিমঝিমানি আর মাথা ঘুড়ানো। মনে হচ্ছে যেন এখনি মাথা ঘুড়ে পড়ে যাবে। কোনভাবে সবকিছু সামলে নিয়ে

জামিলা রান্নাটা শেষ করল। রান্না শেষ করেই বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। শরির যেন ক্রমে ক্রমে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। রাবেয়া বিষয়টা খেয়াল করে তার মাকে বলল, আম্মা! তোমার কি শরির খারাপ লাগছে? এই সময় তো কোনদিন তোমাকে শুয়ে থাকতে দেখি না। জামিলা বলল, "একটু মাথা ব্যাথা করছে রে। রাবেয়া! আমার মাথায় একটু তেল দিয়ে দে না।"
রাবেয়া স্যুকেসের উপর থেকে তেলের কৌটাটা বের করে জামিলার মাথার কাছে গিয়ে বসল। হাতের মধ্যে তেল ঢেলে সুন্দর করে তার মায়ের মাথায় মালিশ করে দিতে লাগল। মাথার মধ্যে নিজের মেয়ের ছোয়া পেয়ে মাথাব্যাথার কথা যেন অনেকটাই ভুলতে পেরেছে জামিলা।

রাবেয়ার বাবা জামাল মিয়া কাজে থেকে ফিরেছে। রাবেয়ার বাবা রাবেয়াকে বলল, রাবেয়া! টিবল থেকে এক বাল্টি পানি যেতে দেনা! আর তোর মা শুয়ে আছে কেন রে?
রাবেয়া টিউবয়েল চাপতে চাপতে বলল, আম্মার নাকি মাথা ব্যাথা করছে। সেই জন্য শুয়ে আছে।
জামাল মিয়া বলল, অসুধ খেয়েছে?
- খেয়েছে।

রাতের খাবারটা যেন কোনভাবেই খেতে পারল না জামিলা। উঠাটাই যেন তার কাছে অনেকটা কঠিন হয়ে গেছে। উঠতে চাইলেই যেন মাথার মধ্যে চক্কর দিচ্ছে।

রাবেয়া তার মাকে বলল, আম্মা! ভাত খাবে না?
জামিলা বলল, খেতে ইচ্ছে করছে না রে! তোরা খেয়ে নে।
- এটা কেমন কথা আম্মা! খাবেনা কেন?
- দুপুরেও তো মনে হয় খাওনি আজকে।
- উঠতে ইচ্ছে করছে না রে।

সেদিন কোনভাবেই রাতে জামিলাকে কিছু খাওয়ানো গেল না। বাবা মেয়ে মিলে সেরাতে খেয়ে উঠল ঠিকই। কিন্তু জামিলার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তার স্বামীকে একবার বলতে চাইল। কিন্তু বলবে কি? চুপ করে থাকলে তো চলবে না।
জামিলা তার মেয়েকে একটা ডাক দেওয়ার সময় খেয়াল করল তার কথা বলতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। কোনরকম রাবেয়াকে সে ডাক দিল। রাবেয়া তার কাছে আসলে জামিলা তাকে বলল, মা! আমার খুব খারাপ লাগছে রে!
- কেমন লাগছে তোমার মা?
- বড্ড খারাপ লাগছে।

রাবেয়ার বাবা ছুটে আসল তার স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে। এসেই বলল, কি হয়েছে তোমার জামিলা? তবে জামিলা যেন কথাই বলতে পারছে না। অবস্থা খারাপ দেখে রাবেয়াকে তার বাবা বলল, তোর মাকে মনে হয় হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অবস্থা বেশি ভালো না। মায়ের এই অবস্থা দেখে রাবেয়া বলল, কি হয়েছে আম্মার?

- জানিনা রে! একটা ভ্যান ডাকতে হবে।
পাশের বাড়ির ভ্যানচালক ইদ্রিস মিয়া। জামাল মিয়া তাকেই ফোন করে ভ্যান নিয়ে দ্রুত আসতে বলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভ্যান চলে আসল। জামিলাকে তোলা হল ভ্যানের মধ্যে। আর এক মূহুর্ত দেড়ি নয়। সবাই তখনি জামিলাকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল।

ঘড়িতে সময় এখন রাত একটা। ভ্যান গাড়ি চলছে আপন গতিতে। রাতের আবছা আবছা আলোয় রাবেয়া জামিলার শরিরের দিকে তাকিয়ে দেখল তার গায়ের রঙ আগের চেয়ে অনেকটা কালো হয়ে গেছে। কোন এক কারণে রাবেয়া জামিলার আংগুলের সেই ক্ষতটা খুজে বের করল। রাবেয়া দেখল হাতের আংগুলটা আগের চেয়ে দ্বিগুণ ফুলে গেছে।
রাবেয়া তার বাবাকে বলল, আব্বা! লাইটটা একটু দাও তো!
জামাল রাবেয়াকে লাইটটা দিল। রাবেয়া টর্চ লাইটটা জামিলার হাতের আংগুলের দিকে ধরে চমকে গেল। রাবেয়া জামালকে বলল, আব্বা! আম্মাকে সাপে কেঁটেছে। জামাল জামিলার আংগুলের দিকে তাকিয়ে দেখল আসলেই তাই। মাঝখানের আংগুলটাতে দুইটা ক্ষত রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে। রাবেয়া সেগুলো আগে খেয়াল করেছিল না। কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেড়ি হয়ে গেছে। নিথর হয়ে গেছে জামিলা।

মারা গেছে।

হাসপাতাল পর্যন্ত যেতেই পারল না তারা। ফিরে আসতে হল তাদের। বাবা-মেয়ে যেন বাকরুদ্ধ। কথায় আছে না,"অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর"। কিভাবে কাঁদতে হবে সেটাই যেন তারা এই মূহুর্তে ভুলে গেছে।
জামিলার লাশটাকে বাড়িতে আনা হল কিছুক্ষন পর। রাজিয়াকে বাপের বাড়ি থেকে ফোন করল রাবেয়া। রাজিয়া ফোন রিসিভ করতেই রাবেয়া কান্নাজরিত কন্ঠে বলল, আপু তারাতারি বাড়িতে আস। আম্মা মারা গেছে!
রাজিয়া কথাটা বিশ্বাসই করতে পারল না। তাই গম্ভীর গলায় বলল, কি বলছিস এসব!
- আপু তুমি তারাতারি আস।

রাজিয়াও ওপাশে কান্না করছে। আচমকা একটা মানুষের মৃত্যুতে এলাকার সবাই কিছুটা হলেও হতবাক হল। যদিও মৃত্যুর কোন বয়স নেই।

রাবেয়াদের কোন ভাই নেই। তারপরেও পুরো পরিবার নিয়ে তারা অনেক সুখী ছিল। কিন্তু রাবেয়ার মা মারা যাওয়ার কারণে তাদের সব সুখ শান্তি যেন কর্পুরের মত উড়ে গেল।

সময় চলে যাচ্ছে। জামাল মিয়ার আর বিয়ে করার ইচ্ছা নেই। বয়স-ও তো কম হল না। দাড়িতে পাক ধরেছে অনেক আগেই। দেখতে দেখতে চারটা বছর কেঁটে গেছে রাবেয়াদের। মৃত মানুষ যতই আপন হোক না কেন ভুলে একদিন সবাই যাবেই। তেমনি জামিলাকেও এই

সময়ের মধ্যে সবাই প্রায় ভুলেই গেছে। অনেক বড়ও হয়েছে রাবেয়া। বিয়ের প্রস্তাব আসছে অনেক জায়গা থেকে। কিন্তু রাবেয়া বিয়ে করতে রাজি না এই সময়। তার ইচ্ছা সে আরো পড়াশোনা করবে। লেখাপড়া করে ডাক্তার হবে। রাবেয়ার মতে বিয়ে হয়ে গেলে পড়াশুনা করা আর সম্ভব না।

কিন্তু তার বাবা সেই কথা শুনতে নারাজ। পাত্রও তার রেডি। সব ঠিকঠাক আছে, শুধু রাবেয়ার অনিচ্ছা। তার বাবা মাঝে মাঝেই তাকে বলে, তোকে এভাবে আর কতদিন ঘড়ে রাখব। দিনের বেলা আমি বাড়িতে থাকি না। তুই এই ঘড়ে সারাদিন একা একা থাকিস। আশেপাশের ছেলেগুলো তো ভালো না। যদি তোকে কিছু করে ফেলে!
জামাল মিয়ার কথার মধ্যে ভয় কাজ করে। নিজের মেয়ের কোন ক্ষতিই সে চায় না। এমনিতে সে নিজে মেয়ের দেখাশোনা করতে পারে না। কি থেকে কি হয়ে যায় কে জানে?

জামাল মিয়া মেয়ের হাত জোর করে বলে, আর না বলিস না! রাবেয়া কি বলবে তা খুজে পায় না। বাবার কথায় সে কি রাজি হয়ে যাবে? হাজার হোক, সে তার বাবা। তার কথা অমান্য করতেও খারাপ লাগে রাবেয়ার।
তাই রাবেয়া বলে, আমি বিয়ে করতে রাজি আছি একটা শর্তে।
জামাল মিয়া নরম গলায় বলে, তোর সব শর্ত আমি পুরো করব মা!
- আমি কিন্তু লেখাপড়া বন্ধ করতে পারব না।
- আজকেই আমি সেই ছেলের সাথে কথা বলব। দেখিস! ছেলেটাও রাজি হয়ে যাবে।

নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে এক ঝলক হাসে জামাল মিয়া। মেয়েকে বিয়ে দিলে তো অনেক টাকা পয়সা ভাংতে হবে। জামিলা মরার পর সংসারটায় যেন ধস নেমে গেছে। বাড়ি থেকে লক্ষি বিদেয় হয়ে গেছে। কোন কাজ করেই যেন এখন শান্তি পায় না জামাল মিয়া। আগে কত টাকাপয়সা জমা হতো। এখন কামাই করার পরেও যেন টাকাগুলো কোথায় খরচ হয়ে যায়। বলতে গেলে সংসারের হিসাব সে রাখতে পারে না। আসলেই সংসারে মেয়েলোকের গুরুপ্ত অনেক।

জামাল মিয়া ছেলের সাথে কথা বলে ছেলেকে রাজি করিয়েছে। ছেলে বলেছে, সমস্যা কোথায়? লেখাপড়া করতে চাইলে করবে। ওর যত ইচ্ছা- করবে, তাতে কোন সমস্যা নেই।
জামাল মিয়ার মাথা থেকে যেন অনেক ভাড়ি বোঝা নেমে গেল।

পরদিন ছেলেপক্ষের পরিবারের সবাই আসলো রাবেয়াকে দেখতে। মায়ের লাল শাড়িটা পড়লে যে ওকে কত সুন্দর দেখায় তা বলার বাইরে। যেকোন ছেলে ওকে দেখলে তাদের চোখ খুলে হাতে চলে আসার মত অবস্থা। কিন্তু এটাই তো তার বাবার ভয়। নাহলে এতো কম বয়সের মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার কোন মানেই হয় না।

সাথে ছেলেও এসেছে তাদের সাথে। ছেলের বাবা আর মা ও ছোট ভাই এসেছে।

- মেয়ে তো আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। এখন বিয়েটা কবে হবে সেটা আপনিই বলুন।
- সেটা আপনারাই বলুন না। আপনাদের যখন সময় হবে।
ছেলের বাবা বলল, সামনের শুক্রবার তাহলে বিয়েটা হয়ে যাক।
জামাল মিয়া যেন খুশিই হল। কিন্তু রাবেয়া আর এ নিয়ে মন্তব্য করল না। যদিও তার বিয়ে করার এখন কোনোই ইচ্ছা নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কাজ করতে হয়।

শুক্রবার আসতে আর মাত্র চার দিন। বিয়ের জন্য কিছু কেনাকাটারও দরকার হয়। বুধবার দিন তার বাবাকে নিয়ে গেল মার্কেটে কেনাটার করার জন্য। বৃহস্পতিবার সারাদিন ঘড়েই ছিল। হাতে পায়ে মেহেদী দিল খুব সুন্দরভাবে। শুক্রবার এসে গেল। আজকে রাবেয়ার বিয়ের দিন। তাদের বাড়িতে সকাল থেকেই বিয়ের হালকাপাতলা আমেজ চলছে। যদিও অত বড় আয়োজন করা হবে না।

দিনটা ভালোই গেল রাবেয়ার। ছেলেও অনেক ভালো। ছেলের নাম রায়হান। বড় বিজনেসম্যান। লেখাপড়াও করেছে অনেক। অন্তত রাবেয়ার পড়াশুনার গুরুপ্তটা বুঝতে পারলেই হল।

বিকেলবেলা সবাই একসাথে বসল। কাজি সাহেব এসেছেন। বিয়ে পড়ানো হবে এখন। রায়হানের বাবাও উপস্থিত আছেন। রাবেয়া আর রায়হানকে একসাথে আনা হল। কাজি সাহেব নিজের মত কাজ করে যাচ্ছেন।

- আলম সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ রায়হান এর সাথে মোহাম্মদ জামাল মিয়ার কন্যা মোছাম্মত রাবেয়া বেগবের ৩ লক্ষ টাকার দেনমহরের বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন করা হইল।
বলো মা কবুল!

কাজি সাহেবের কথায় কি রাবেয়া কবুল বলবে? কিছু একটা তো করতে হবে তাকে। চুপ করে বসে থাকলে তো হবে না।
রাবেয়া নিজের বাবার দিকে একপলক তাকাল। এইসময় বাবার মুখমন্ডলে খুশির আভা দেখতে পেল সে। বাবার খুশিতেই সে খুশি।
- কবুল।
।
।
।
সংসার জীবন ভালোই চলছে তাদের। রায়হান ব্যাবসার কাজে মাঝে মাঝেই দূরে চলে যেতে হয়। সেইসময় রাবেয়া একা ঘড়ে থাকে। এই বাড়ি থেকেই রাবেয়া কলেজে যায়। বিয়ের আগে যেমন ভেবেছিল তার কিছুই হয় নি। এখানেও সে দিব্যি পড়ালেখা করতে পারছে। সকালে আর বিকালে রান্না করতে হয় তাকে। এইটুকুই যা কাজ। তাছাড়া রাবেয়ার আর কোন কাজ কর্ম নেই। বিয়ের চার মাস হয়ে গেছে। রায়হানকেও সে এই কয়দিনে ভালোবেসে ফেলেছে।

জামাল মিয়ার শরিরও নাকি কিছুদিন ধরে ভালো না। রাবেয়া তার বাবাকে শ্বশুর বাড়ি আসতে বলল। কিন্তু তার বাবা কাজের ছুতো দিয়ে আসতে চায় না। রাবেয়া ভাবে, বাবা বাড়িতে একা থাকে। কি খায় না খায়, আল্লা ভালো জানে।
একদিন রায়হান আর রাবেয়া মিলে তার বাবাকে দেখতে বাড়িতে গেল। অনেকদিন পর রাবেয়া বাপের বাড়ি আসল। আগে এটাই তাদের নিজের বাড়ি ছিল। কিন্তু এখন এই বাড়িতে আত্বীয় হয়ে আসতে হয়।

জামাল মিয়া আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছে। বাবার অবস্থা দেখে রাবেয়া কান্না শুরু করে দিল।
- বাবা! তোমাকে ছাড়া থাকতে আমার ভাল্লাগে না। আর তোমার এই অবস্থা হয়েছে কেন? ঠিকমত খাওয়াদাওয়া কর না?(কাঁদতে কাঁদতে)
- কে বলেছে আমি খাই না।
- তুমি মিথ্যা বলছ বাবা! আপু ফোন করেছিল। বলেছে বাবার নাকি শরির খারাপ।
- আরে! কিছুদিন ধরে একটু জ্বর জ্বর লাগল। তয় এখন অনেকটা কমে গেছে। তুই এনিয়ে চিন্তা করিস না।

রায়হান জামাল মিয়াকে বলল, আব্বা! আপনি কিন্তু ইচ্ছা করলে আমাদের বাড়িতে আমাদের সাথে যেতে পারেন।
- কি যাই! বলো বাবা! নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে ভাল্লাগে না।
- কিন্তু তুমি যাই বলো বাবা এইবার কিন্তু তোমাকে আমাদের সাথে যেতেই হবে।
অনেকদিন পর রাবেয়া বাড়িতে এসে আশেপাশের সবার সাথেই একটু সময় গল্প করল। দুপুর বেলা সবাই খাওয়াদাওয়া করে রাবেয়ারা বিকাল বেলা বাড়ির উদ্যেশ্যে রওনা হল। নিজের বাবাকে এইবারো নিয়ে যাওয়া হল না। জামাল মিয়া নিজেই বলল, সামনের ঈদের মধ্যে গিয়ে তোকে একবার দেখে আসব। জবাবে রাবেয়া বলল, আসবে কিন্তু!

সময় আরো গড়িয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে রাবেয়ার HSC পড়িক্ষা শেষ হয়ে গেল। আগের ঈদে জামাল মিয়া এসেছিল। একদিন থেকেও ছিল। কিন্তু রাবেয়া একটা বিষয় ভালোই বুঝতে পারছে তার বাবার শরির আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। হাত-পাগুলো শুকিয়ে পাট কাঠির মতো হয়ে গেছে। রাবেয়া একবার বলেছিল, "বাবা! আমাদের এখানে একটা ভালো ডাক্তার আছে। চলোনা আজকে তার কাছে যাই!" কিন্তু জামাল মিয়া যেতে রাজি হল না। সে বলল,"আরে! কয়েকদিন ধরে অনেক কাজ করতে হয়। তার জন্যই শরিরের এই অবস্থা হয়েছে। তোর মা বেঁচে থাকলে আমার আর এই অবস্থা হতো না।"

অল্প সময়ের জন্য রাবেয়ার নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল মায়ের ফেলে আসা সৃতিগুলো। রাবেয়ার চোখ ছলছলে হয়ে আসল। সে নিজেকেই দোশ দিতে লাগল, সেদিন যদি তার মায়ের হাতটা ধরে আগেই বুঝতে পারত যে তাকে সাপে কামড়েছে।

তাহলে তার মা আজকেও বেঁচে থাকত।

সেবারই রাবেয়ার বাবার সাথে রাবেয়ার শেষ দেখা। ঈদের এগারো দিনের মাথায় রাবেয়ার কাছে এক ভয়ানক খবর আসল। রাতের বেলা ঘুমের সময় জামাল মিয়া মারা গেছে। সংবাদ শুনে আর নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারল না। সেখানে বসেই হাউমাউ করে কান্না আরাম্ব করে দিল। তারমধ্যে দুই দিন আগে রায়হান খুলনা গিয়েছে ব্যাবসার কাজে। এই মূহুর্তে আসতে পারবে কিনা তা বলা যায় না। তবে রায়হানকে বিষয়টা ফোন করে জানানো হল। ওপাশ থেকে রায়হানও চিন্তায় পড়ে গেল। তবে আসার চেষ্টা করবে।

রাবেয়া ও তার শশুর শ্বাশুড়ি মিলে রওনা হল তাদের বাড়িতে। সবাই এসেছে। রাজিয়া অনেক আগেই এসে পড়েছে। দুই বোন মিলে তার মৃত বাবাকে দেখে সে কি কান্না!
তাদের মা অল্প বয়সে চলে গেছে সেটাও কোনরকমে মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মা মারা যাওয়ার পর মায়ের মতো আগলে রাখা বাবাও যে মারা যাবে সেটা রাবেয়া মেনে নিতে পারে নি।

মৃত্যুর কারণটা এখনো তাদের কাছে অজানা। কিন্তু সেটা আর অজানা থাকল না। কোন একটা কাজে বাবার বিছানার তোষকের নিচে হাত দিল রাবেয়া। তোষকের নিচ থেকে একটা রিপোর্ট বের হয়ে আসল। একটা প্রিসক্রিপশন। আর কিছু ব্লাড টেষ্টের রিপোর্ট। তারিখ দেখে বুঝতে পারল, এক মাস আগেই সেগুলো করা হয়েছিল। রাবেয়া সেগুলোর কিছুই বুঝতে পারল না। তাই তার দুলাভাইয়ের কাছে গিয়ে সেই কাগজগুলো দেখাল।

দুলাভাই সেগুলো কিছুক্ষন খুটিয়ে খুটিয়ে দেখার পর সে আশ্চার্য হয়ে গেল। কিছুক্ষন যেন সে থমকে গেল।
- রিপোর্টে কি লেখা আছে দুলাভাই?
- বাবা আমাদের কাছ থেকে এতোকিছু লুকিয়ে রেখেছিল?
- কি হয়েছিল বাবার?
- ব্লাড ক্যান্সার। রক্তের মধ্যে ক্যান্সার হয়েছিল।
রাবেয়ার মাথা রিতিমত ঘুড়তে আরাম্ব করে দিল।

- এসব কি বলছেন দুলাভাই?
- আমি তো আর তোমাকে মিথ্যা কথা বলছি না।
এই বলে রিপোর্টের একটা পৃষ্টা বের করে দেখাল আর বলল,এই দেখো! বাবার হিমোগ্লোবিন আর প্লেটলেট এক্কেবারে কমে গেছে। আর WBC সাধারণের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে।

রাবেয়া সেখানেই কান্না করতে করতে বলল, বাবা আমাদের কাছ থেকে এগুলো কেন গোপন করে রাখল?
আস্তে আস্তে সবাই জেনে গেল রাবেয়ার বাবা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। রাজিয়া

তো বিষয়টা জানার পর তার আফসোস আরো বেড়ে গেল। ঘটনাগুলো যেন তার কাছে সপ্নের মত মনে হচ্ছে।
কিন্তু এখন সবার আফসোস করে আর কিই বা লাভ হবে? যে চলে গেছে তাকে হাজার চেষ্টা করেও আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল তিনটা মাস। রাবেয়া মায়ের মত তার বাবাকেও একসময় ভুলে গেল। দুঃখ কষ্ট, অনুসুচনা একসময় সে এক্কেবারে ভুলে গেল। জীবন তো আর থেমে থাকে না। সবকিছু ভালোই চলছে। বাবার মৃত্যুর সময় রায়হান অনেক চেষ্টা করেও আসতে পারে নি। তবে মারা যাওয়ার একমাস পরে এসেছিল। শশুরের কবর দেখে সে নিজেও কান্না থামিয়ে রাখতে পারে নি।

আজকে রায়হান আবার বাড়িতে এসেছে। এইবার নাকি অনেকদিনের জন্য এসেছে। কুরবানির ঈদের সময় মাত্র ছয় দিনের জন্য এসেছিল। এইবার এসেই নাকি সব আত্বিয় স্বজনদের সাথে দেখা করবে।

রাবেয়া রায়হানকে বলল, তা এইবার কতদিন থাকবে তুমি?
- অনেকদিনের মতো থাকব। প্রায় ছয় মাসের মতো।
- তোমার ব্যাবসা সামলাবে কে?
- সে লোক আমি রেখে দিয়েছি। তোমার চিন্তা করতে হবে না।
- তা এতোদিন এখানে থেকে কি করবে তুমি?
- বাড়ির তো একটা কাজেও আমি হাত দিতে পারি না। বাড়ির টুকটাক কাজ করব। ভাবছি কিছুদিন বাড়িতেই রেষ্ট নেব। আর আত্বিয়স্বজনদের বাড়িতেও একটু খোজখবর নিতে যাব। অনেকদিন ধরে তো কোথাও যাওয়া হয় না। তাছাড়া ভাবছি আমরা দুজনে আরেকটা কাজ করব।
- কি কাজ?
রায়হান রাবেয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিল। রাবেয়া সেটার অর্থ বুঝতে পারল। সেও রায়হানের দিকে তাকিয়ে মুচকি একটা হাসি দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই সুসংবাদটা এসে পড়ল। একদিন বিকালবেলা খবর আসল রায়হান বাবা হতে চলেছে আর রাবেয়া- মা। খবর শুনে তো সবাই খুশি। আর শুরু হয়ে গেল রাবেয়ার প্রতি রায়হানের বিশেষ যত্ন। দেখতে দেখতে আরো একমাস পার হয়ে গেল। রাবেয়ার পেটের বাচ্চার বয়স এখন এক মাস সতেরো দিন।
রায়হান একদিন পরিকল্পনা করল সে পরিবারের সবাইকে নিয়ে তাদের মামার বাড়ি যাবে। পরিবারের সবাই বলতে, রাবেয়া, রায়হান ও তার ছোট ভাই আর বাবা-মা। অনেক বছর আগে রায়হানেরা গিয়েছিল। তাই ভাবল, একবার সেখান থেকে ঘুড়ে আসা যাক। আর রায়হানের বিয়ের সময়ও তার মামারা আসতে পারে নি। তাই রাবেয়াকেও সবার সাথে পরিচয় করিয়ে

দেওয়া যাবে।

বাড়িতে এখন বেশি কাজকর্ম নেই। তাই কালকেই রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হল। সেদিনই সবাই সবার ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল। রায়হানের ইচ্ছা সেখানে গিয়ে নাকি সবাই দুদিন থাকতে হবে। অনেকদিন পর বলে কথা।
একটা মাইক্রোবাস ভাড়া করা হল। সকালবেলাই তারা রওনা হবে। যথারীতি খেয়েদেয়ে সবাই রেডি় হয়ে নিল। ব্যাগ তো আগেই গোছানো ছিল। একটু পরেই একজন ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসে পড়ল। তারপর সবাই গাড়িতে উঠে পড়ল।

সবাই একে অপরের সাথে আলোচনা করছে। রায়হান রাবেয়াকে বলল, তা এই কদিন সেখানে গিয়ে কি করবে?
- কেন কি করতে হবে?
- ওহ! তোমাকে নিয়ে তো আমি ঘুড়তে যেতে পারব না। জানো! ছোটবেলায় আমরা কত্তো মামার বাড়ি যেতাম। স্কুল বন্ধ থাকলেই চলে যেতাম সেখানে। তখন আরো নানি-নানারা ছিল। আরো মজা হতো। জানো! মামার বাড়ি থেকে একটু দূরে রাজপ্রাসাদের মতো একটা বিশাল বড় দালান আছে। সেটা অনেক বছর আগের পুরোনো। সময় পেলেই আমরা সেখানে চলে যেতাম। দালানের সামনে একটা বিশাল বড় মাঠ আছে। দেখলেই মনটা ভড়ে যেত। আমার সাথে সেখানে যাবে?

রাবেয়ার মা এতোক্ষন ছেলের কথা শুনছিল, কথাগুলো শুনে রাবেয়াকে বলল, না! ওসব জায়গায় যেতে হবে না। জায়গাটা ভালো না। জ্বীন, শয়তানের আড্ডাখানা। বাচ্চার কিছু হয়ে গেলে কি হবে?

রায়হান তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আম্মা! তুমি এখনো এসব বিশ্বাস করো?
- আমি যেতে নিষেধ করেছি ব্যাস। আমার বৌমাকে আমি সেখানে যেতে দিচ্ছি না।
- ঠিক আছে। তুমি যখন নিষেধ করছ তাহলে নিয়ে যাব না। তবে শান্ত মামার হাতে যে এক কাপ চা খাওয়ানো যাবে না সেটা কিন্তু আমি মানব না। সেই মামার চায়ের দোকানে যে কি চা বানায় না! এখনো আমার সেই স্বাদ মুখে লেগে আছে।
এই কথা শুনে তার মা আর কোন কথা বলল না। কিছুক্ষনের জন্য সবাই চুপ রইল। রাবেয়া রায়হানকে বলল, তুমিনা বলেছিলে আরো আত্ত্বিয়স্বজনদের সাথে দেখা করবে, তা আর কাদের কাদের বাড়িতে যাবে তুমি?
রায়হান বলল, আপাতত এখনো ভেবে দেখি নি। তবে ইচ্ছা আছে একবার ছোট খালার বাসায় যাব। খালা আমাদের দুই ভাইকে অনেক আদর করে। মাঝে মাঝেই ফোন করে আসতে বলে। তুমি কি যেতে চাও?
- আমি যাব।
- তাহলে তোমাকে একসময় নিয়ে যাব।
- তারপর আর কোথায় কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে তোমার?

- আমি আর বলতে পারব না।
- কেন আমাদের বাড়িতে একদিন যাবে না?
- তুমি যদি যেতে চাও তবে অবশ্যই যাব। সে নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।
- আচ্ছা! আমাদের বাচ্চার জন্য কেনাকাটা করবে কবে?
- সময় হলেই করব। তবে এখন কথা বন্ধ কর। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমার এখন মাথা ব্যাথা করছে।
- আমার কথাগুলো তোমার বিরক্ত লাগছে?
- এই মূহুর্তে লাগছে।
- তাহলে জীবনেও তোমার সাথে আর কথা বলব না।
- আমি কি এমনভাবে বলেছি।
- তাহলে কিভাবে.........

এমন সময় একটা ট্রাক গাড়ি তাদের মাইক্রোবাসের সামনে এসে পড়ল। ধাক্কা লেগে সাথে সাথেই বিকট একটা শব্দ হল। গাড়ির সামনের অংশ এক্কেবারে থেতলে গেল। ট্রাকটা হয়তো ব্রেকফেল করেছিল। রাবেয়ার কিছু খেয়াল নেই তাদের সাথে কি হয়েছিল। সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

যখন রাবেয়ার জ্ঞান আসল তখন সে খেয়াল করল তার মাথায় একটা ব্যান্ডেজ লাগানো আছে। মাথাটা প্রচুর ব্যাথা করছে। তাছাড়াও শরিররের নানান জায়গায় ব্যাথা করছে। কিন্তু এতো তারাতারি এসব কেমন করে ঘটল? আর বাকি সবাই কোথায়?
একটা নার্স রাবেয়ার সামনে এসে বলল, ঠিক আছেন তো আপনি? কিন্তু রাবেয়া তাকে উল্টো প্রশ্ন করে বসল।
- বাকিরা কোথায়? আব্বা-আম্মা কোথায়?
- ভালো আছে, আপনি চিন্তা করবেন না।
- কিন্তু আপনার গলার স্বর এমন শোনা যাচ্ছে কেন? নিশ্চই ওদের কিছু হয়েছে। আমাকে ওদের সাথে দেখা করান প্লিজ!
- আপনি এখন উঠবেন না প্লিজ। ডাক্তার আপনাকে উঠতে নিষেধ করে দিয়েছে।

অনেক সময় হয়ে গেল। রাবেয়া ভাবতে লাগল, নানু বাড়ি যাওয়া আর হলো না। কিন্তু রায়হান কেমন আছে?

নার্সের কথা যে সেদিন রাবেয়াকে শুধু শান্তনা দেওয়ার জন্য ছিল তা পরেরদিন জানা গেল। রাবেয়ার শশুর মারা গেছে। কথাটা রাবেয়া জানতে পেরে যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। যেন সে এগুলো সপ্ন দেখছে।
রাবেয়া চিৎকার করে ডাক্তারদের বলতে লাগল, আমি এসব বিশ্বাস করি না। বাবা মরতে পারে না। আপনারা মিথ্যা বলছেন। আমি বাবার সাথে দেখা করব। পাশেই রাবেয়ার শাশুড়ি চুপ মেরে বসে আছে।

রাবেয়া তার মায়ের কাছে গিয়ে তার কাঁধে জোরে ঝাকি দিয়ে বলল, আম্মা! ডাক্তাররা যেই কথা বলছে তা কি সত্যি? বলুন মা। চুপ করে আছেন কেন?
কিন্তু রাবেয়ার মা যেন থ হয়ে আছে। রাবেয়া আবার ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, ডাক্তার সাহেব! আ,,আমার স্বামী কেমন আছে? ডাক্তার রাবেয়াকে বলল, আপনার স্বামীর অবস্থা খুব সিরিয়াস। মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগার কারণে ব্রেনের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে গেছে। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করে যাচ্ছি তাকে বাঁচানোর জন্য।
রাবেয়া যেন আর কিছু নিতে পারছে না। ধপাস করে ফ্লোরের মধ্যে বসে পড়ল। দুর্বল শরিরে সে আর কিছু ভাবতে পারছে না।

যখন রাবেয়ার জ্ঞান ফিরল তখন নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় আবিস্কার করল। হাতে ভর দিয়ে উঠার সময় সে খেয়াল করল তার হাতের মধ্যে স্যালাইনের একটা সুই গেথে রাখা হয়েছে। উঠতে গিয়েও রাবেয়া উঠতে পারল না। শরির আগের চেয়েও অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। তখনি মনে হতে লাগল তার বাবা আর স্বামীর কথা। মনে করতেই ডুকরে কান্না আসতে লাগল। সকালেও সব কিছু ভালো ছিল। নিমেষের মধ্যেই যে এমন হয়ে যাবে তা রাবেয়া কল্পনাও করতে পারে নি।

পরদিন রাবেয়ার শশুরের সাথে আরেকটা লাশ বের হল। রাবেয়া একটা লাশের মুখের কাপড় সরিয়ে দেখল সেটা তার শশুর। তার শশুর গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল। সরাসরি ধাক্কাটা তারই শরিরে লাগে। রাবেয়া দেখতে পেল তা শশুরের মুখের অনেক জায়গা থেকে মাংস উঠে গেছে।

কিন্তু আরেকটা লাস কার? রাবেয়া সেটার দিকে এগিয়ে যেতে আরাম্ব করল। কাছে গিয়ে মুখের কাপড়টা সরাতেই রাবেয়া একটা চিৎকার দিয়ে উঠল। লাসটা আর কারো না। তার স্বামী রায়হানের। রাবেয়া যেন আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না। সোজা ডাক্তারের জামার মধ্যে ধরে ঝাকি দিয়ে কান্না করতে করতে বলল, এসব কিভাবে হল? আপনারা কিছুই করলেন না কেন?
- দেখুন! জীবন মরণ সব খোদার হাতে। এখানে আমাদের কোন হাত নেই। আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমরা তাকে বাঁচাতে পারি নি।

দুচোখ যেন আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে আসছে তার। মাথা ঘোড়াচ্ছে। একজন মানুষ একসাথে এতো চাপ নিতে পারে না। একসময় রাবেয়া সেন্সলেস হয়ে গেল। নার্সেরা তাকে ব্রেঞ্চের উপর নিয়ে গিয়ে বসাল। মাথা পানি দিল।

এক নিমেষের মধ্যেই যে তাদের সংসারে এমন ধস নেমে যাবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। কত সুন্দর সংসার ছিল তাদের। চোখের পলকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।
দুজনের লাশ বাড়িতে আনা হল। জানাজার নামাজ পড়ে দুজনের লাশকে একসাথে কবর

দেওয়া হল। রায়হানের ছোট ভাইটাও অনেক কষ্ট পেয়েছে।
রাবেয়া ঘড়ের মধ্যে চুপ করে বসে আছে। তার পেঁটে যে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাকে বাবা বলে ডাকবে? দুনিয়াতে আসার আগেই যে তার বাবা দুনিয়া ত্যাগ করল। এখন বাচ্চাটার কি হবে?
.....

সময় আরো এগিয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আরো এক মাস পার হয়ে গেল। স্বামী ছাড়া যেন সংসারে সে একটা বোঝা হয়ে আছে। সংসারে কেবল মাত্র তিনজন মানুষ। রোজগার করার আর কেউ রইল না। রাবেয়ার দেবর কেবল লেখাপড়া করছে। এটা তো তার রোজগারের বয়স না। আর সেটা তো কোন ঝামেলার বিষয় না। ঝামেলার বিষয় হলো এটাই যে একটা বিধবা মেয়ে তাদের সংসারে থেকে অন্ন ধ্বংস করবে, সেটা তো আর হতে পারে না। রাবেয়া সংসারেই টুকটাক কাজ করে। আর বেশি কিছু করতে পারে না। একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে যায়। আগের তুলনায় এখন নিয়মিত খাওয়াদাওয়াও হচ্ছে না। স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে যেন খাওয়াদাওয়া সব উড়ে গেছে। শরির শুকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার শ্বাশুড়ির সেই দিকে কোন খেয়ালই নেই। প্রথম প্রথম যেই মেয়েটার উপর অনেক ভালোবাসা জন্মেছিল, এখন মেয়েটাকে দেখলেই কেমন যেন অসহ্য লাগে।
তার শ্বাশুড়ির এখন ইচ্ছা, মেয়েটা এই বাড়ি থেকে বিদায় হলেই সে বাঁচে। কিন্তু সেটা কি সহজ কথা?

কিছুদিন ভালোই চলছিল সবকিছু। রাবেয়ার শাশুড়ি দাঁতে দাঁত চেপে কিছুদিন সহ্য করল। কিন্তু কয়দিনই বা সে এসব সহ্য করবে। একদিন সামান্য একটা কারনে বউয়ের সাথে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলল সে। কথায় কথায় একসময় বলেই ফেলল, আর কত খাবি আমার সংসারে। জামাই তো মরল। এখন আর এই সংসারে থেকে কি করবি? দয়া করে বাড়ি থেকে বিদেয় হয়ে আমাকে উদ্বার কর।

রাবেয়া যেন তার শ্বাশুড়ির মুখ থেকে এসব আশা করে নি। অবাক হয়ে তার শ্বাশুড়ি আম্মাকে বলল, আপনি এভাবে আমাকে বলতে পারলেন?
- তো কিভাবে বলব? পায়ে ধরে? আমি অত কথা বলতে পারব না বাপু। ভালোয় ভালোই বলছি এই বাড়ি থেকে সোজা বাপের বাড়ি চলে যা।
- আপনি কি এসব কথা মন থেকে বলছেন?
- মন থেকেই বলছি। কেন? সন্দেহ হয়? আমাকে পাগল মনে হয়? না। আমি পাগল না। আমি সাফ সাফ কথা বলে দিলাম এই বাড়ি থেয়ে এই মূহুর্তে বিদেয় হ।

রাবেয়া কথাগুলো শুনে ঘড়ে গিয়ে ব্যাগ গোছাতে আরাম্ব করল। আর বলতে লাগল, ঠিক আছে। যাচ্ছি। এতোদিন জামাই ছিল, আমাকে একটা কথাও বলতে পারেন নি। আমার জামাই বেঁচে থাকলে এসব কথা বলার সাহস হত?
একটা কথা মনে রাখবেন! আমি এই বাড়ি থেকে চলে যাব। কিন্তু একেবারে না। আমার স্বামীর সম্পত্তির ভাগ আমি নিয়েই যাব।

এই কথা শুনে তার শ্বাশুড়ি মা বলল, আ-মোলোজা! দুইদিন সংসার করল না। এর এখন সম্পত্তি চাইতে আসছে।
- দুইদিন সংসার করি আর একদিনই সংসার করি। আমি আপনার মৃত ছেলের স্ত্রী।
কথাটা বলেই রাবেয়া তার বাপের বাড়ি রওনা হল।

বাড়িতে কেউ নেই। রাবেয়াকে সবকাজ কিছুদিন একাই করতে হবে। কয়েকদিন তাদের চাচা-চাচীদের সহায়তায় ভালোই দিন কাঁটল। কিন্তু এভাবে আর কতদিন? চাচা-চাচীরা আর কতদিন রাবেয়াকে যত্ন করবে?
কয়েকদিন পরেই সবকিছুর অভাব যেন একেবারে যেঁকে বসল। তখনি একদিন বাড়িতে রজিয়া আসল। নিজের বোনকে এরকম অবস্থায় দেখে রাজিয়া অবাক হয়ে গেল। রাজিয়া বলল, এরকম অবস্থা হয়েছে কেন তোর? খাওয়াদাওয়া করিস না?
- খেতে ইচ্ছা করেনা রে আপু!
- বারে! খেতে ইচ্ছা হবেনা বলে খাওয়াদাওয়া করতে হবে না? পেঁটের বাচ্চাটার কথা ভেবে দেখেছিস?
রাজিয়ার কথা শুনে রাবেয়া কান্না আরাম্ব করে দিল। আর বলল, বাবা-মা দুজনেই মরে গেল। কিন্তু নিজেকে কখনো একা বোধ করিনি। রায়হান মারা যাবার পর আমি এক্কেবারে একা হয়ে গেছি রে আপু। দুনিয়াটা কেমন যেন খালি খালি লাগে। কিচ্ছু করতে ইচ্ছা করে না। আরো কষ্ট হয় তখন, যখন মনে হয় আমার বাচ্চাটা কখনো বাবা ডাকতে পারবে না। বাবার মুখ দেখতে পারবে না।
রাজিয়া তার ছোট বোনের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, কাদিস না বোন। নিজেকে শক্ত কর। যাদের কেউ নেই তাদের আল্লাহ আছেন। তার তাছাড়া আমি তো আছি। তোকে আমি আমাদের বাসায় নিয়ে যাব। সেখানেই থাকবি।
- সত্যি আমাকে নিয়ে যাবে?
- হ্যা। অবস্যই নিয়ে যাব।

যাক! অন্তত রাবেয়ার একটা থাকার জায়গাও হল। রাজিয়ার একটা ছেলে আছে। নাম রাতুল। কিছুদিনের মধ্যেই রাবেয়ার সাথে রাতুলের ভালো সম্পর্ক হয়ে গেল। এখানে বেশ ভালোই লাগছে রাবেয়ার। কিছুদিন বোনের বাড়িতে থেকে স্বামীর অভাবটা অনেক ভুলে গেছে সে। খাওয়াদাওয়াও হচ্ছে ভালো। বিকালবেলা রাতুলের সাথে বাসায় ছাদে যায় রাবেয়া। আশেপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে সবকিছু দেখে। সুর্য ডোবার দৃশ্যটা এতো সুন্দর দেখা যায় তা রাবেয়া এখানে থেকে বুঝতে পারে।

মাঝে মাঝে রাবেয়া, রাজিয়া আর রাতুল মিলে বাইরে ঘুড়তে যায়। বেশি দূরে যায় না। শুধু রাবেয়ার জন্য। এতোদিন যে রাবেয়া এতো সুন্দর দিন কাঁটবে তা সে কল্পনা করতে পারে নি।
....

দেখতে দেখতে আরো এক মাস পার হয়ে গেল। দিনকাল ভালোই চলছিল রাবেয়ার। প্রথম

এক মাস ভালো চললেও পরে রাবেয়ার মন আস্তে আস্তে পাল্টাতে আরাম্ব করল। একটা বাড়িতে আত্বিয়দের মত আর কতদিন থাকবে? এটা তো আর তাদের নিজেদের বাড়ি না। একসময় এই বাড়িতে নিজেকে রাবেয়া খুব ছোট ভাবতে আরাম্ভ করল। যদিও রাজিয়া তাকে আগের মতোই ভালোবাসে। কিন্তু তারপরেও রাবেয়ার মনে একটা চিন্তা কাজ করে। তাকে ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে হবে। এখানে তো আর সারাজীবন পাড় করে দেওয়া চলবে না।

রাবেয়ার ভাবনাটা খোলাশা হল তখন, যখন সে একদিন রাজিয়াদের রুমে লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শুনতে পেল। তার দুলাভাই রাজিয়াকে বলছে, এভাবে আর কতদিন মেয়েটাকে পুষবে বলোতো?
- কেন তোমাকে না বলি ওকে একটা চাকরি দিয়ে দাও। নিজের খরচ নিজেই চালাতে পারবে।
- হুহ! চাকরি তো গাছের পাতা, যে একটা ছিঁড়ে এনে দিলাম।
- তাহলে কি করবে ও!
- জানি না। তোমার বোন তুমি বুঝোগে। আমার আর এসব ভাল্লাগে না। একমাস এভাবে খায়িয়ে দায়িয়ে কোন মানুষকে পালা যায়? লাভ কি?
- তুমি তো ডাক্তার। এইসময় একটা মেয়ের শারিরিক অবস্থার কি হতে পারে সেটা তো ভালো করেই জানো। তারপরেও তোমার ইচ্ছা করছে নিজের শালীকে নিয়ে এমন কথা বলতে?
কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

রাবেয়া এসব শুনে নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না। দুলাভাইও তাহলে আমাকে এখন পর ভাবে? তাহলে এখানে থেকে কি হবে? রাবেয়া ঠিক করল বোনের বাসায়ও আর সে থাকবে না। অন্য কোন জায়গায় সে চলে যাবে। ভাগ্যে যাই থাকুক না কেন।
রাজিয়া পরদিন সকালবেলা রাবেয়ার ঘড়ে এসে দেখতে পেল রাবেয়া নিজের ব্যাগ গোচ্ছাচ্ছে। সেটা দেখে রাবেয়া বলল, কি হয়েছে রাবেয়া? কোথাও যাবি নাকি?
- আমি চলে যাব আপু!
রাজিয়া চোখ বড় বড় করে বলল, কোথায় যাবি তুই?
- শহরে।
- কী বলছিস এসব?
- আমি ঠিকই বলছি। এখানে আর কতদিন থাকব। যেতে তো একদিন হবেই।
- তা নাহয় বুঝলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবি কোথায়? কে আছে তোর ওখানে?
- অনেকেই আছে।
মিথ্যেটা বলতেই হল রাবেয়াকে। তা না হলে রাজিয়া তাকে কোনমতেই যেতে দিবে না।
- কে আছে তোর ওখানে?
- সে তমি চিনবে না। আমার আত্বিয়। সেখানে গিয়ে চাকরি করব।
- সে নাহয় যাবি। কিন্তু এভাবে না কয়ে সবাইকে ছেড়ে হুট করে চলে যাবি?
- আজকেই যেতে হবে আমাকে।

অন্য সময় হলে রাজিয়া তার বোনকে থামাত। কিন্তু আজকে সে তার বোনকে কোনপ্রকার বাধা

দিল না। বরং সে বলল, তোর দুলাভাইকে বলব গাড়ি দিয়ে পৌছে দিতে?
- তা লাগবে না। আমি ঠিক যেতে পারব। তবে আপু, আমার কাছে টাকাপয়সা কিছু নেই। হাতখরচটাও নেই। আমাকে কিছু টাকা দিবে?
- সেটা নাহয় দিলাম। কিন্তু তোর শরিরের অবস্থা দেখেই তো আমার চিন্তা হচ্ছে। আমি বলি কি, আর এক মাস থেকে যা।
- না আপু। থাকা যাবে না। কোনভাবেই আমি থাকতে পারব না।

সেদিন রাবেয়াকে থামানো গেল না। রাজিয়া রাবেয়ার হাতে চার হাজার টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, এতে চলবে তোর?
- চলবে আপু।
- তাহলে আবার আসিস।
- আসবো মাঝে মাঝে।

রাবেয়া রওনা দিল। যাওয়ার পথে রাজিয়া একবার রাবেয়াকে ডাকল। এই, একবার শোন।
- কি বলো?
- তোর দুলাভাইকে ভুল বুঝিস না।
কথাটা শুনে রাবেয়া তার বোনকে কি বলবে তা ভেবে পেল না। বরং আবার সে রওনা হল। পেছন থেকে রাজিয়া আবার বলল, কথাটা ভেবে দেখিস।
কিন্তু রাবেয়া আর পেছনের দিকে তাকাল না। চলে গেল। গন্তব্য ঢাকা। এখান থেকে ঢাকা গিয়ে সে একটা কাজ খুঁজবে। পারলে সৎ একটা ছেলেকে সে বিয়ে করে নিবে। এটাই এখন রাবেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাবেয়া বাসে উঠে পড়ল। সরাসরি ঢাকা গিয়ে কি করবে তাও রাবেয়া এখন জানে না।

বাস থামল। রাবেয়া নেমে পড়ল। চারপাশে অচেনা অজানা হাজার হাজার রাস্তা। কিন্তু রাবেয়া কোনটার দিকে যাবে সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে তো আর সারাজীবন দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না। একদিকে যেতেই হবে। সুর্য ঠিক মাথার উপরে। প্রচন্ড রোদ আর রাস্তার ধুলো। একটা ছাতা আর মাক্স নিয়ে আসতে পারলে ভালো হত। ছাতা নাহয় এখন কিনতে পারবে না। কিন্তু একটা মাক্স তো অন্তত কিনতে পারে। শহরের প্রচন্ড ধুলা ময়লায় নাক ঝাঝালো হয়ে এসেছে।

রাবেয়া সকালেও কিছু খেয়ে বের হয় নি। পাশের একটা হোটেল থেকে কম দামের মধ্যে কিছু খেয়ে নিল। অযথা বেশি কিছু খেয়ে টাকা ব্যয় করা চলবে না। এই টাকা ফুরিয়ে গেলে চলবে কিভাবে?

সেদিন রাবেয়া তেমন কিছু করতে পারল না। বিকেল হয়ে আসছে। একটা থাকার জায়গার দরকার। রাবেয়া ঠিক করল আজকে রাতের জন্য সে একটা হোটেল ভাড়া করবে। সিংগেল রুম। সেখানেই রাতটা কাঁটাবে।

এখন রাবেয়া বুঝতে পারছে আগে থেকে পরিকল্পনা না করে এখানে এসে তার কতটা ভুল হয়েছে। সামান্য চার হাজার টাকা তো নিমেশের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে। তখন তার কি হবে? আর কে টাকা দিবে তাকে? রাবেয়া ঠিক করল কালকের মধ্যেই ছোটোখাটো হলেও একটা কাজ জোগার করে ফেলতে হবে।

পরদিন সকালবেলা খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়ে পড়ল রাবেয়া। আজকে একটা কাজ পেতেই হবে যেভাবে হোক।
অনেক হাটতে হাটতে সামনে একটা গার্মেন্টস কারখানা দেখতে পেল। চাইলে সে এখানেও চেষ্টা করে দেখতে পারে। কোন কিছু না ভেবে সে সেখানে ঢুকে পড়ল। আশেপাশ অনেক মেয়েদের সে দেখতে পেল। একটা কম বয়সী মেয়েকে সে বলল, এই গার্মেন্টসে কি কোন কাজ পাওয়া যাবে? মেয়েটা সাধারণভাবে একটু ভেবে বলল, আমরা তো এসব খবর বলতে পারব না। তবে চাইলে আপনি ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে পারেন।
- ম্যানেজারের রুম কোনদিকে?
- এই ডানদিকে গিয়ে ১২ নাম্বার রুম।
- ধন্যবাদ আপনাকে।

রাবেয়া ১২ নাম্বার রুমে গিয়ে দেখল একটা খাটোমতন লোক কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে। রাবেয়া গলা খাকারি দিয়ে বলল, আসতে পারি? লোকটা কথা না বলে হাত দিয়ে আসতে ইশারা করল।
লোকটা বলল, বসুন। কি বলতে চান বলুন?
রাবেয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে বলল, স্যার। এখানে আমাকে একটা ইয়ে মানে কাজের ব্যাবস্থা করে দিতে পারবেন?
- তার মানে কাজ চাইতে এসেছ?
- হ্যা।
- তা কেমন কাজ চাও।
- যে কোনো কাজ আমি করতে পারব।
ম্যানেজার লোকটা শান্ত গলায় বলল, আমার হাতে তো কর্মী নেওয়ার কোন ক্ষমতা নেই। তাই আমি এই মূহুর্তে কিছু করতে পারছি না।
- কিছু তো একটা করুন।
- বলছেন যখন একটা উপায় বের করে দিতে পারি। আপনাকে একটা ঠিকানা দিবো। সেখানে গিয়ে আপনি কথা বলতে পারলে কাজ হতে পারে।
- কার ঠিকানা?
- বড় বাবুর। এই গার্মেন্টসের মালিক। উনার সাথে কথা বলে চেষ্টা করতে পারেন।
- তাই করব। ঠিকানাটা দিন প্লিজ।
ম্যানেজার লোকটা একটা কাগজের মধ্যে একটা ঠিকানা লিখে দিল। আর বলল, এই ঠিকানায় চলে যান।
রাবেয়া কাগজটা হাতে নিয়ে বলল, আমি এখানে জীবনে প্রথম এসেছি। কোনকিছুই চিনি না।

- সেটা নিয়ে আপনার চিন্তা করতে হবে না। যেকোনো রিকসাওয়ালাকে বললেই তারা আপনাকে পৌছে দিবে। তবে রিকসা ভাড়া ৫০ টাকার উপর দেবেন না।
রাবেয়া লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে বের হয়ে গেল।
যাক! লোকটা খারাপ না। একটা কাজ পেয়ে গেলে লোকটাকে আরেকবার ধন্যবাদ দিতে হবে।

একটা রিকসাওয়ালাকে ঠিকানা দেখিয়ে সে বড় বাবুর উদ্দেশ্যে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরে না।
তাই যেতেও বেশি সময় লাগল না।
বড় বাবুর বাসায় ঢুকতেই দুজন দারোয়ান পথ আটকাল। যে কেউ বড় বাবুর সাথে দেখা করতে পারে না। বড় বাবুর অনুমতি লাগে। একজন দারোয়ান বড় বাবুর কাছে অনুমতি আনার জন্য গেল। আবার কিছুক্ষনের মধ্যেই ফিরে আসল। এসেই সে রাবেয়াকে বলল, যান! ভিতরে যান।
দারোয়ান গেট খুলে দিল। রাবেয়া চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। এটা যেন একটা রাজপ্রাসাদ। লোকটা হয়তো অনেক বড়লোক।
রাবেয়া একজন লোকের পিছু পিছু যাচ্ছিল। লোকটা পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল।
অবশেষে রাবেয়া বড় বাবুর সামনে এসে উপস্থিত হল।
বড় বাবু বলল, কি চাই?
কথা বলতে তার অনেক লজ্জা হচ্ছে।
রাবেয়া চুপ করে আছে দেখে বড় বাবু আবার বলল, কি হল? কথা বলছ না কেন?
রাবেয়া লজ্জাকে দুরে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমি ঢাকা শহরে নতুন এসেছি। থাকা খাওয়ার কোন জায়গা নেই। কোন কাজ পাচ্ছি না। আমাকে আপনার গার্মেন্টসে একটা কাজের ব্যাবস্থা করে দিন না!
বড় বাবু কিছুক্ষন চিন্তা করার পর বললেন, কে পাঠিয়েছে এখানে তোমাকে?
- আজ্ঞে! ম্যানেজার।
- একাই এখানে এসেছ?
- হ্যা।
- পালিয়ে নাকি?
- না।
- বিয়ে করেছো?
- করেছিলাম। জামাই মারা গেছে। তার জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি একটা কাজের জন্য।
- তোমার বয়স তো অনেক কম। কি করতে পারবে তুমি? আর এই বয়সেই বিয়ে করেছো কেন?
- বাবার ইচ্ছায়।
- বুঝতে পেরেছি।
- একটা কাজের ব্যাবস্থা করে দিন না!

বড় বাবু কিছুক্ষন ভাবলেন। তারপর বললেন, এই বয়সের কাওকে কম্পানিতে নেওয়া তো

অনেক ঝামেলা।
- কেন?
- কোনভাবে যদি জানাজানি হয়ে যায় যে এই গার্মেন্টসে কম বয়সি মেয়েকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। তাহলে আমার জেল-জরিমানা হবে যে। তাছাড়া তোমাকে দিয়ে ওসব কাজ হবে না। কোন দুর্ঘটনায় ঘটলে তো কম্পানির দুর্নাম।
- তাহলে আমার কি হবে? আমি কোথাও কাজ পাবো না!
- চিন্তা করো না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আসলেই তুমি অনেক বিপদে পড়েছো।
রাবেয়া হালকা করে মাথা ঝাকাল।
- রান্নাবান্না করতে পারো?
- হ্যা।
- বাবুর্চিকে সাহায্য করতে পারবে?
- পারবো।
- তাহলে এই বাড়িতেই থেকে যাও। তোমার কাজ শুধু সকালে আর রাতে রান্নায় বাবুর্চিকে সাহায্য করা। থাকা খাওয়া ফ্রি।

কথাটা শুনে রাবেয়া অনেক খুশি হল। একবার বড় বাবুর পায়ে ধরে সালাম করতে ইচ্ছে হল তার। কিন্তু তা করল না। বড় বাবু তখন বললেন, তবে একটা শর্ত আছে।
- কিসের শর্ত?
- তুমি মাত্র এক মাস কাজ করতে পারবে।
- কেন?
- এই মুহূর্তে বাবুর্চির সাহায্যের জন্য কেউ নেই। তাই তোমাকে রাখলাম। পুরোনো কাজের লোক ফিরে আসলে তোমাকে চলে যেতে হবে। আগের লোক এক মাসের জন্য ছুটি নিয়েছে।
- ঠিক আছে।

কি আর করার। রাবেয়া চিন্তা করল এই একমাস সে এখানে কোনরকম কাঁটিয়ে অন্য জায়গায়ও কাজ খুঁজবে। রাবেয়া বড় বাবুকে ধন্যবাদ জানাল।

এমনিতেও রাবেয়া হয়তো এক মাসই কাজ করতে পারত। পেটের বাচ্চাটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। এখন তাও কোনমতে কাজকাম করতে পারছে। কয়েকদিন পর তো তাও করতে পারবে না। ইচ্ছে হচ্ছে বোনের বাড়ি চলে যেতে। কিন্তু পরক্ষনেই তার দুলাভাইয়ের কথাগুলো মনে পড়ে গেল।

এখানেই থাকবে সে। এখানেই থাকবে। যত বিপদই আসুক না কেন। রাবেয়া যাবে না। এই বাড়িতেই সে থাকবে। আজকে বিকাল থেকে কাজ আরাম্ব করতে হবে। এই বাড়ির কাউকেই রাবেয়া চিনে না। বাড়িতে অনেক মানুষ। সবাই কি একই পরিবারের? নাকি আলাদা আলাদা পরিবারের? এটা রাবেয়া জানে না।
বিকাল বেলা রাবেয়ার সাথে পরিচয় হল এখানকার বাবুর্চি ইমান আলির সাথে। বয়স ষাট এর

কাছাকাছি। চেহাড়া দেখতে ফরসা। তার নাকি এখানে অনেক সুনাম। মাঝে মাঝে অনেক অনুষ্ঠানেও নাকি তার ডাক আসে। রাবেয়া ভাবল, যাক! তার কাছ থেকে যদি অন্তত রান্নার রেসিপিগুলো ভালোভাবে শিখে নিতে পারি তাহলে তো ভালোই হবে। একসময় পরিচিত হল ইমান আলির সাথে। এখন তার কোন কাজ নেই। এখন সে বাসার ছাদের উপরে একটা ব্রেঞ্চের মধ্যে বসে সিগারেট টানছে। কাজ না থাকলে হয়তো লোকটা এখানে বসেই সিগারেট খায়।

রাবেয়া তার কাছ গেল। তার কাছে গিয়ে একটা কাঁশি দিল। এতে লোকটা রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি রাবেয়া না?
রাবেয়া নিচু গলায় উত্তর দিল, হ্যা।
লোকটা বলল, বসো- একটু কথা বলি।
রাবেয়া ব্রেঞ্চের এক পাশে গিয়ে বসল। লোকটা তখন অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা ব্রেঞ্চের সিমেন্টের মধ্যে ঘষা দিয়ে নিভিয়ে ফেলল। পরে সে সেটা আবার সিগারেটের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল।
ইমান আলি রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার ঘটনা শুনেছি। খুব খারাপ লাগল। তবে এখানে কিছুদিন ভালোমতনই থাকতে পারবে। কোন অসুবিধা হলে আমাকে জানাতে পারো।
রাবেয়া লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আচ্ছা! এতো মানুষ কেন? এই বাসার সকল মানুষ কি একই পরিবারের?
- নাহ। বড় বাবু মানে আলম চৌধুরীর ছোট বোনের পরিবারের সবাই এসেছে। এইজন্যই চারদিকে একটু রমরমা ভাব। তারা চলে গেলেই একটু খালি খালি লাগবে। আলম চৌধরী ও তার বড় ভাই ইকবাল চৌধুরীর পরিবার মিলেই এই বাসায় থাকে।

সেখানে বাবুর্চি লোকটার সাথে আর কথা হলো না। একেবারে বিকালবেলা দেখা হলো সেই লোকটার সাথে। আসলেই লোকটা ভালো রান্না করতে পারে। রাবেয়া এখন জানতে পারল তাদের সাথে আরেকটা ছেলে কাজ করে। নাম সজিব। সে বাবুর্চির দেওয়া লিষ্ট দেখে বাজার করে আনে। সজিব ছেলেটা রাবেয়ার চেয়ে অনেক ছোট। আপনি করে বলে।
এখন রাবেয়া জানতে পারল আসলেই ইমান আলি অনেক ভালো রান্না করতে পারে। আজকে বিরিয়ানি রান্না করা হচ্ছে। কিছুক্ষন আগে ছেলেটা বাজার করে আনল। সেগুলো দিয়েই রান্না বসানো হয়েছে। রাবেয়ার কাজ হলো মরিচ, পেয়াঁজ, রসুন ইত্যাদি ছিঁলানো। তাছাড়া আর কোন বিশেষ কাজ নেই।
কিছুক্ষনের মধ্যেই বিরিয়ানির ঘ্রাণ নাকে আসতে লাগল। রাবেয়া বলল, বাহ্! আপনি তো অনেক সুন্দর বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন। কে শিখিয়েছে আপনাকে?
- আমাদের এসব জানতে হয়। আর রান্না করতে করতে অভ্যাস হয়ে গেছে। কোন মসলা কতটুকু দিতে হয় তা মুখস্থ হয়ে গেছে।
- আচ্ছা! এভাবে বিরিয়ানি রান্না করা কি আমাকে শেখাবেন?
- কেন? তুমি বিরিয়ানি রান্না করতে জান না?
- জানি। তবে আপনার মতো করে না।

- এসব রান্নাবান্না কউকে শেখানো যায় না। বুঝেছ? রান্না হচ্ছে একটা শিল্প। তুমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে সেটা তৈরি করতে পারবে। জ্ঞান লাভের জন্য যেমন সাধনা করা দরকার। রান্না শিখতে হলেও তেমন সাধনার দরকার পড়ে। অনেক চেষ্টা করতে হবে। আমি যখন প্রথম প্রথম রান্নার কাজ আরাম্ব করি তখন মোটেও আমি এরকম ছিলাম না। তখন আমার বিরিয়ানি থেকে এতো পরিমান ঘ্রাণ বের হতো না। কিন্তু হাল ছাড়ি নি। অনেক চেষ্টা করতে করতে একসময় সেটা আয়ত্বে আসে। এখন যদি তোমাকে বলি আমার মতো বিরিয়ানি রান্না করতে চাইলে তোমাকে এটা মেশাতে হবে, সেটা মেশাতে হবে, আরো কত কিছু। কিন্তু আমার মতো রান্না কোনদিনই হবে না। হয়তো আমার চেয়ে খারাপ হবে না হয় আমার চেয়ে ভালো হবে।
- তাহলে কি হবে?
- রান্নার কাজ যেহেতু তোমার না। তাই আমি কোন সময় কোন জিনিসটা দেই সেটা ভালোমতোন খেয়াল করবে।
রান্নার সময় আরো কথা হলো অনেক্ষন।
রান্না প্রায় শেষের দিয়ে। কথা বলতে বলতে কখন যে রান্না হয়ে গেছে তা রাবেয়া টেরই পায় নি।

আত্বিয়স্বজনদের খাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা খেল। আসলেই পরিবারের লোকের সংখ্যা কম। রাবেয়া গুনে দেখল নয় জন। তাদের খাওয়া শেষ হলে রাবেয়ারা কয়েকজন খেল। বিরিয়ানি খেতে দারুন হয়েছে।

রাবেয়ার সাথে আরেকটা মেয়ের পরিচয় হল। বাড়ির কাজের মেয়ে। নাম নাজমা। বয়সে রাবেয়ার চেয়ে তিন-চার বছরের বড়।

যাক! মনের কথা বলার মতো তো একজন মানুষ পাওয়া গেল। এভাবে সময় পার হয়ে যেতে লাগল। রাবেয়া চিন্তা করেছিল সে আরো কিছু জায়গায় কাজ খুঁজবে। খুঁজেও ছিল। কিন্তু পায় নি। পাবেই বা কেমন করে? রাবেয়ার মতো হাজার হাজার মানুষ কাজের সন্ধানে আসে ঢাকায়। কয়জনকেই বা কাজ দেওয়া যায়। কম্পানির লোকেরা নানান বাহানা দিয়ে তাদের বিদায় করে দেয়। দেখতে দেখতে বিশ দিনের মতো সময় পার হয়ে গেল।
রাবেয়া একবার ইমান চাচার মতো বিরিয়ানি রান্না করার চেষ্টা করেছিল। ভালো হয়েছিল। তবে ইমান আলির মতো ভালো না। হয়তো লোকটার হাতের মধ্যে জাদু আছে।
নাজমার সাথে রাবেয়ার প্রতিদিনই অনেক কথা হয়। নাজমা পাশের গলিরই একটা মেয়ে। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু জামাই নাকি ভালো না। নেশা করে, তাকে মারধর করে। তাই নাজমা জামাই বাড়ি থেকে চলে এসেছে। এখন নাজমা খুব ভালো আছে। বাবা নাকি রিক্সা চালায়। মা নাকি সেলাইয়ের কাজ করে। সংসার খুব ভালো চলছে।

কিন্তু রাবেয়ার ব্যাপারটা নাজমার ঠিক বিপরীত। বাবা-মা নেই। স্বামী খুব ভালো ছিল। মারা গেল। এখন কি আছে তার?
রাবেয়া নাজমার কাছে এসব কথা বলে খুব শান্তি পায়। মনে হয় নাজমার সাথে কথা বললে

মাথা থেকে কিসের বোঝা যেন কমে যায়।
নাজমাও তাকে শান্তনা দিয়ে বলে,তুমি চিন্তা করো না। আমি তো আছি। এই দশদিন কাজ করার পর তোমাকে আর কাজ করতে হবে না। আর করা ঠিকও হবে না। কিছুদিন পর তোমার বাচ্চার চার মাস চলবে। এখন ভাড়ি কাজ করলে বাচ্চার যে ক্ষতি হবে।

রাবেয়া ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কিন্তু কি করবে সে। খেতে হলে তো কাজ তাকে করতেই হবে। রাতে নিচের তলায় রাবেয়ার থাকার একটা জায়গা হয়েছে। ইমান আলি ও নাজমা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে চলে যায়। রাবেয়া একা একাই সেই অন্ধকার ঘড়ের মধ্যে শুয়ে থাকে। বোনের দেওয়া চার হাজার টাকা থেকে আর মাত্র দেড় হাজার টাকা আছে। এই বাড়িতে আসার পর সে আর কোনরকম টাকার অপচয় করে নি। তবে একটা টর্চ লাইট কিনেছে। এই একলা ঘড়ে থাকতে তার অনেক ভয় হয়।

বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। কোন ছোট ছেলে হয়তো জানালার কাঁচের একটা অংশ বল মেরে ভেঙ্গে দিয়েছে। সেই ভাঙ্গা অংশ দিয়ে বাইরে থেকে প্রচন্ড ঠান্ডা বাতাস রাবেয়ার গায়ে লাগছে। এই বাড়ি থেকে একটা কম্বল অন্তত পেয়েছে। সেটা আছে বলেই রক্ষা। রাবেয়ার মনে পড়ে যায় অতীতের জীবনের গল্পগুলো। কত সুন্দর ছিল সেই সময়গুলি। মা ছিল, বাবা ছিল, স্বামী ছিল, সবাই ছিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল। পুতির মালার সুতা ছিড়ে গেলে যেমন সব পুতি একসাথে পড়ে যায়, ঠিক তেমনি রাবেয়ার-ও একসাথে সব শেষ হয়ে গেল। এগুলো ভাবতে ভাবতে রাবেয়ার চোখের পানি চলে আসে। মাঝে মাঝে মরে যেতে ইচ্ছে হয়। ইস! এগুলো যদি একটা সপ্ন হত। কিন্তু চাইলেই তো আর তা হয় না।

রাবেয়া শুকিয়ে যাচ্ছে। পুষ্টির অভাবে না, চিন্তায়। পেট ভাড়ি ভাড়ি লাগে এখন। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। বসে থাকলে উঠে দাড়াতে কষ্ট হয় এখন। কোমড়ে চিনচিনে ব্যাথা হয়। কিন্তু তার পরেও তো কাজ করতে হয়। একসময় রাবেয়া চিন্তা করে এই মাসের বেতন সে এখনি নিয়ে নিক। আর কাজ করতে পারবে না রাবেয়া।

রাবেয়া আজকে আবার বড় বাবুর সামনে গিয়ে দাড়াল। বড় বাবু তাকে দেখেই বলল, কেমন আছ রাবেয়া? রাবেয়া আস্তে করে বলল, ভালো আছি। রাবেয়ার এই রকম গলার আওয়াজ শুনে বড় বাবু বলল, কোন সমস্যা থাকলে তুমি আমাকে বলতে পার।
রাবেয়া যে প্রেগন্যান্ট এই খবর নাজমা ছাড়া এখানকার কেউ জানে না। বড় বাবুও জানত না। কিন্তু আজকে বড় বাবুকে জানাতেই হবে। বলতে লজ্জা হচ্ছে রাবেয়ার। এই রকম পরিস্থিতিতে সে আগে কখনো পরেনি বলে লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু তাকে যে বলতেই হবে।
রাবেয়া চুপ করে আছে দেখে বড় বাবু বললেন, কি হলো! চুপ করে আছ কেন?
রাবেয়া আমতা আমতা করে বলল, আর তিন দিন পরেই মাস ফুরিয়ে আসবে। আমার কাজও শেষ হয়ে আসবে। তখন আমি কি করব। আপনি ছাড়া এই ঢাকা শহরে তো আমার আপন কেউ নেই। আমাকে আবার একটা কাজ জোগার করে দিতে পারবেন?
রাবেয়া হয়তো ভেবেছিল বড় বাবু কিছুক্ষন ভেবে একটা সন্তোষজনক উত্তর দিবেন। কিন্তু তা

না করে বড় বাবু রাবেয়াকে চমকে দিয়ে ধমকের স্বরে বলল, এই! আমি কি কাজের কারখানা যে একটা কাজ বানিয়ে তোকে দিব আর তোর পেছনে টাকা ঢালব।
রাবেয়া আসলেই চমকে গেল বড় বাবুর তুমি থেকে তুই-য়ে আসার কারণে। বড় বাবু আবার বলতে লাগলেন, সারাদিন আমি তোদের কাজ দেওয়ার কথা শুনতে শুনতে একসময় আমি পাগল হয়ে যাই আরকি। স্যরি! আমাকে মাফ করুন। ম্যানেজারের কাজ থেকে এই মাসের টাকা নিয়ে বিদেয় হতে পারেন।
- বড় বাবু! আমাকে একটু দয়া করুন। আমার পেঁটে একটা বাচ্চা। এখান থেকে চলে গিয়ে আমি কোথায় যাব?
- হুম। আমি এখন আপনাকে এখানে বসিয়ে বসিয়ে দুধ কলা দিয়ে পুশব, তাই না?
- আর একটা কাজের ব্যাবস্থা করে দিন না, প্লিজ।
- হুহ, প্লিজ। তোদের মতো ফকির মিসকিনদের মুখে প্লিজ শব্দটা মানায় না। যাহ্! রাস্তায় বসে ভিক্কা করগে।

এতো অপমান রাবেয়ার আর সহ্য হল না। সাথে সাথেই সে চলে গেল সেখান থেকে। আজকেই সে এখান থেকে চলে যাবে। কিন্তু রাবেয়া একটা কথা এখনো ভেবে পাচ্ছে না যে তার মতো একজন মানুষ এভাবে এমন রেগে গেলেন কেন?

বিকালবেলা রাবেয়া ম্যানেজারের কাছে টাকা চাইতে গেল। ম্যানেজার তাকে এই মাসের পাওনা টাকা দিয়ে দিল। রাবেয়া গুনে দেখল সেখানে ছয় হাজারের মত টাকা আছে। টাকাগুলো সে তার ব্যাগের মধ্যে তুলে রাখল। টাকাগুলো গুছিয়ে নিয়ে রাবেয়া ভাবল একবার নাজমার সাথে দেখা করা দরকার। নাজমা হয়তো এখন কাজ করছে। তাই কিছুক্ষন অপেক্ষা করে ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল। নাজমার সাথে কথা বলেই সে এখান থেকে চলে যাবে।
নাজমার সাথে দেখা হল বিকাল বেলা। নাজমা বলল, কি বলবে?
- আমি এখানে আর থাকব না।
- কি বলছ এসব? কোথায় যাবে তাহলে?
- জানি না।
- জানি না মানে?
- আমি এখানে আর কাজ করতে পারবো না বোন। বড় বাবু আমার সাথে অনেক খারাপ ব্যাবহার করেছে। আমাকে ফকির মিসকিন বলেছে। আমাকে ভিক্ষে করতে বলেছে।
কথাগুলো বলেই রাবেয়া কান্না আরাম্ব করে দিল। জন্ম হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কেউ রাবেয়াকে ফকির মিসকিন বলে ডাকেনি। সবাই ভালোবেসেছে। আজ এই প্রথম বড় বাবু তার মুখের সামনে তাকে ফকির বলে অপমান করল। সেই অপমান রাবেয়া সহ্য করতে পারবে না। বড় বাবু একটু সাহায্য করেছে বলে কি সে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবে?
নাজমা বলল, বড় বাবুর সাথে কোন খারাপ ব্যাবহার করেছিলি?
- না। শুধু আর কয়েকদিন এখানে থাকতে চেয়েছিলাম। এই বাড়ি থেকে গিয়ে কোথায় থাকব, তাই। তুমি আমাকে আঁটকিও না। আমি যেখানে ইচ্ছা চলে যাব। আমাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

- বললেই হল? আমিও একজন মেয়ে। আর কেউ তোমার কষ্ট না বুঝলেও আমি তোমার কষ্ট ঠিকই বুঝি।
নাজমা কিছুক্ষন থেমে গিয়ে বলল, আচ্ছা তুমি কি সেলাইয়ের কাজ করতে পারো?
- পারি। আম্মা আমাকে শিখিয়েছিল।
- আমার মা যেখানে সেলাইয়ের কাজ করে সেখানে কাজ করবে? আমি কথা বলে দেখতে পারি।

রাবেয়া কিছুক্ষন নাজমার কথা শুনে চুপ করে রইল। সে তো সেলাই করার কাজ ভালোই করতে পারে। ছোটবেলা থেকেই সে নিজের কাপড় নিজেই শেলাই করেছে। আর মেয়ে মানুষদের এসব শিখতে হয়।
রাবেয়া নাজমাকে আমতা আমতা করে বলল, দেখলে খুব ভালো হতো!
নাজমা বলল, ঠিক তাছে তাহলে। আমার সাথে যাবে?
- যাব।
- তাহলে আজকের দিনটা তোমাকে এখানেই কোনরকম কাঁটাতে হবে।
- এখানে আমি আর থাকতে পারব না বোন। আমার বেতন আমি নিয়ে নিয়েছি। বড় বাবু জানতে পারলে আমাকে আস্ত রাখবে না।
নাজমা একটু ভেবে বলল, তাহলে আজকে রাতে আমাদের বাড়িতে যাবে?
এই ছাড়া রাবেয়ার কাছে আর কোন রাস্তা নেই। রাবেয়ার রাজি হতে হল।

রাত নয়টার দিকে নাজমা কাজ শেষ করে রাবেয়াকে নিয়ে তাদের বাড়িতে রওনা হল। দুজনে একটা রিকসায় উঠে পড়ল।

নাজমাদের ঘড়টা অনেক পুরনো। টিনের মধ্যে মরিচা পড়ে গেছে। ঘড়ের ভেতর থেকে বিন্দু বিন্দু আলো বাইরে এসে পরে। নাজমা ঘড়ে এসে তার মাকে ডাকতে আরাম্ব করল। ডাক শুনে ঘড় থেকে ঘোমটা দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসল নাজমার মা। নাজমা তার মাকে বলল, আম্মা! তোমাকে যে রাবেয়ার কথা বলেছিলাম না? এই সেই রাবেয়া। আজকে ও আমাদের এখানে থাকবে।
নাজমার মা সল্প গলায় রাবেয়াকে বলল, ভেতরে আস মা।
রাবেয়া নাজমাদের ঘড়ের ভেতরে গেল। এককালে ঘড়টা পাকা ছিল। এখন সিমেন্টের আস্তরণ উঠে গিয়ে ঘড়ের বিচ্ছিরি অবস্থা হয়েছে। রাবেয়া আসবাবপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখল আসবাবপত্রও প্রচুর। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। ঘড়ে বেশি জায়গা নেই বলেই এই সমস্যা হয়েছে। দুইটা রুম। হয়তো একটাতে নাজমা থাকে।
কিছুক্ষন থাকার পর রাবেয়া এও বুঝতে পারল যে নাজমার মা খুব সল্পভাষী। রাবেয়ার সাথে এতোক্ষনে সে দু চারটা ছাড়া একটাও কথা বলে নি। একটু অবাকই হল।
নাজমার কাছে জানতে পারল তার বাবা এখনো আসে নি। সে নাকি অনেক দেড়ি করে আসে। রাতের বেলা রিকসা চালালে অনেকেই বেশি টাকা দেয়। সেই জন্য।

নাজমা জানাল আজকে রাতেই সে তার মায়ের সাথে এসব নিয়ে কথা বলবে। দিনের বেলাই এই বাড়িতে কেউ থাকে না। বাড়ির যত রকমের কাজ, সব কাজ রাতের বেলায়ই সারতে হয়। এমনকি কাপড়টাও রাতের বেলা ধুয়ে রাখতে হয়। দিনের বেলা সেগুলো শুকায়।

নাজমার মা আসার সময় বাজার করে আনে। নাজমা বাড়িতে গিয়ে সেগুলো রান্না করে।
রাবেয়ার এই জায়গাটা খুব ভালো লাগছে। চারদিকে কেমন যেন রমরমা ভাব। ছোট ছোট ছেলেরা এখনো বাইরে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। বড় বাবুর বাড়ির পরিবেশটা অনেক শান্ত। কিন্তু এখানকার পরিবেশ তেমনটা নয়। বাতাসে একটা ঝাঝালো গন্ধ। কিন্তু ভালো লাগছে। দূরে কেউ একজন জোরে সাউন্ড দিয়ে গান চালু করেছে। সেটাই একনাগারে বেজে চলেছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা কুকুরের ডাক-ও কানে আসছে।

নাজমার রান্না করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। প্রতিদিনই এমনটা হয়। একটু পড়েই নাজমার বাবা এসে পড়ল। নাজমা বাবাকে হাত-মুখ ধোয়ার পানি এগিয়ে দিল।

সবাই খেতে বসল। ভাত আর আলু দিয়ে পুটি মাছের তরকারি। এই তরকারিটা রাবেয়া অনেকদিন পর খেল। আগে মা রান্না করত। শ্বশুর বাড়িও মাঝে মাঝে রান্না হতো। কিন্তু বড় বাবুর বাসায় এটা কোনদিনই রান্না হয় নি। অনেকদিন পর তরকারিটা খাওয়ার কারণে রাবেয়ার কাছে অনেক মজা লাগছে।

খাওয়াদাওয়ার পর নাজমা তার মায়ের কাছে গিয়ে রাবেয়ার সকল সমস্যার কথা ভালোমতন জানাল। তার মাকে বলল, সে যেন রাবেয়ার ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মালিকের সাথে আলাপ করে।
নাজমার মা তাকে জানাল, কালকে সকালে যেন রাবেয়া তার সাথে মালিকের কাছে যায়।

পরের দিন সকালবেলা নাজমার মা আর রাবেয়া রওনা হল। রাবেয়াকে সে একটা বিশাল বড় মার্কেটের ভিতর নিয়ে গেল। রাবেয়া অবাক হয়ে বলল, এই মার্কেটেই আপনি সেলাইয়ের কাজ করেন?
- হুম। তুমি যদি ভালো সেলাই করতে পারো তাহলেই ওরা কাজে রাখবে। নইলে কিন্তু কাজে রাখবে না।
রাবেয়া হালকা মাথা ঝাকাল।

কিছুক্ষন পরে তারা দুজনে মার্কেটের ভিতরের একটা দোকানের সামনে এসে দাড়াল। একটা বয়স্ক লোক দোকানে বসে আছে। লোকটা নাজমার মাকে সালাম দিল। রাবেয়াকে দেখে লোকটা একটু বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে?
নাজমার মা সেই লোকটাকে রাবেয়ার সব কথা খুলে বলল। সবটা শুনে সেই লোকটা বলল, কাজ চাইতে আসলেই তো আর দেওয়া যায় না। কেমন কাজ পারে সেটাও তো ব্যাপার।
লোকটা রাবেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, তা- তুমি কেমন কাজ পার?

রাবেয়ার একটা উত্তর দেওয়ার আগেই নাজমার মা বলে ফেলল, ভালোই! ভালোই কাজ পারে।
লোকটা বলল, বললেই তো হবে না! একটা পরিক্ষা কিন্তু তোমাকে দিতে হবে।
রাবেয়া আবার মাথা ঝাকাল।

রাবেয়ার পরিক্ষা হচ্ছে। তার বয়সী একটা মেয়ে তাকে একটা বাচ্চা মেয়ের ফ্রকের কাটিং করা কাপড় এনে দিল। মেয়েটা বলল, এটা ভালোভাবে সেটাই করবে, ঠিক আছে!
রাবেয়া রাজি হল। এর আগেও তো রাবেয়া তার নিজের ফ্রকের কাজ করেছে। এ আর এমন কি! বিসমিল্লাহ বলে রাবেয়া শেলাই করার কাজ শুরু করে দিল।

কতক্ষন সময় লাগল রাবেয়ার সেটা খেয়াল নেই। যখন কাজ শেষ হল তখন রাবেয়ার পাশে কেউ নেই। অগত্যা কিছুক্ষন বসে থাকতে হল। যখন মেয়েটা আসল তখন রাবেয়া সেই মেয়েটাকে ফ্রকটা দেখিয়ে বলল, কাজ শেষ। মেয়েটা রাবেয়ার হাত থেকে ফ্রকটা নিয়ে চলে গেল আর রাবেয়াকে বলে গেল এখানে অপেক্ষা করতে।
নাজমার মা চলে গেছে অনেক আগেই। এই মার্কেটের কোন জায়গায় সে কাজ করে তাও রাবেয়া জানে না।

কিছুক্ষন পর মেয়েটা ফিরে আসল। মেয়েটা মনে হয় ভালো সংবাদই নিয়ে আসল। রাবেয়া একটা ব্রেঞ্চের উপর বসে ছিল। মেয়েটিকে দেখে সে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, সবকিছু ঠিক আছে তো?
- তোমার সেলাইয়ের কাজ এমদাদ সাব পছন্দ করেছে। কাল থেকে কাজে আসতে পারবে।
কথাটা শুনে রাবেয়া প্রচন্ড খুশি হল। মেয়েটাকে সে ধন্যবাদ জানাল।
মেয়েটা বলল, আজকে তোমাকে সব কিছু ঘুড়িয়ে ঘুড়িয়ে দেখাচ্ছি। মেয়েটা একে একে পুরো মার্কেটটা ঘুড়িয়ে দেখাল। নিচের তলায় সারি সারি কাপড়ের দোকান। শত শত কাস্টমার। আর উপরের তলায় কাস্টম ক্লথ সার্ভিস। রাবেয়াদের কাজ সেখানেই। মেয়েটা কয়েকটা লোকের সাথেও পরিচয় করিয়ে দিল।
একসময় মেয়েটা রেবেয়াকে বলল, আর হ্যা! কমলা আন্টির (নাজমার মা) কাছ থেকে জানতে পারলাম তুমি নাকি প্রেগনেন্ট! বাচ্চার নাকি চার মাস চলছে?
রাবেয়া হ্যা সুচক মাথা ঝাকাল।
মেয়েটা আবার বলল, এই সময় একটু কম পরিশ্রম করবে। আর কোন সমস্যা হলে আমাকে জানাবে। আর আমিও মাঝে মাঝে তোমাকে দেখতে আসব।

একসময় রাবেয়ার সাথে নাজমার মায়ের দেখা হল। দোতালার ডানদিকের শেষের রুমে সে কাজ করে। মেয়েটা রাবেয়ার কাজের জায়গাটাও দেখিয়ে দিল।

তার পরের দিন থেকে রাবেয়া দোকানে কাজে আসতে লাগল।

টানা সাত দিন পর কমলা আন্টির সাথে আজকে দেখা হলো। কমলা আন্টি বলল, "নাজমা

তোমাকে যেতে বলেছে। একদিন যাবে আমাদের বাড়িতে?" রাবেয়া বলেছে সে যাবে। কিন্তু রাবেয়ার যে এখন অনেক কাজ।

রাবেয়া কাছেই একটা বাসা ভাড়া নিয়েছে। মাসে দু হাজার টাকা ভাড়া দিতে হবে। খাওয়াদাওয়া চালানোর জন্য টাকাপয়সা তার কাছে এখন আছে। কোনরকম বাজার সদাই সে নিজেই করতে পারে। রাবেয়া যেই বাসায় থাকে সেই বাসার পাশের বাসায় একটা মহিলা থাকে। রাবেয়াকে সে চেনে। অনেক আদরও করে তাকে। মাঝে মাঝে খাওয়ার জন্য রাবেয়াকে ডাকে।
রাবেয়ারও একদিক দিয়ে অনেক সুবিধা হয়েছে। অন্তত এই সময় কথা বলার মত একজন মানুষ পাওয়া গেছে।
মহিলাটির নাম ফাতেমা বেগম। তারমতো সেও অনেক কষ্টে দিন পার করেছে। এখন একটা বড় লোকের বাড়িতে রান্নাবান্না, কাপড়চোপড় ধোয়ার কাজ করে। সেই টাকা দিয়েই কোনরকম পেট চলে যায়। রাবেয়া জানতে পারল তার নাকি একটা ছেলেও ছিল। কিন্তু ছেলেটা নাকি চিকিৎসার অভাবে মারা গেছে।
ফাতেমা বেগম নিজের চোখ মুছতে মুছতে বললেন, জানো! নিজের চোখের সামনে মরল ছেলেটা। অথচ আমি মা হয়ে কিছু করতে পারলাম না। কত ডাক্তারের কাছে গিয়ে পায়ে ধরে অনুরোধ করেছি, কেউ আসতে চাইল না। ঢাকা শহরে সবাই যার যার মত ব্যাস্ত। কেউ কারো কথা চিন্তা করে না। জানো রাবেয়া! আমার ছেলের চোখটা যে কত সুন্দর ছিল। তা মুখে বলা যাবে না। চোখের মনীটা ছিল ঘণ কালো। ঠিক ওর বাবার মতো। মরার আগে সেই চোখ দিয়ে যখন আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়েছিল না! মনে হচ্ছিল নিজের কলিজাটা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি।
ফাতেমা বেগম চোখ মোছার সাথে সাথেই আবার চোখ ভিজে আসে।

রাবেয়া উৎসুক দৃষ্টিতে আবার বলে, আপনার স্বামীর কি হয়েছিল?
ফাতেমার মনটা আরো বেজার হয়ে গেল। সে বলল, সে আগে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত। ঘড়ে টাকাপয়সা ছিল না। অসুখ থাকা সত্যেও সেদিন কাজে গেল। বলেছিলাম যেও না। কিন্তু শুনল না আমার কথা।
সেদিন বিকালবেলা খবর শুনে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। হাসপাতাল থেকে ফোন আসে, আপনার স্বামী সাত তলা বিল্ডিংয়ের ছাদ ঢালাই করার সময় হটাৎ মাথা ঘুড়ে নিচে পড়ে গেছে। বেঁচে থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। সাথে সাথেই সেই জায়গায়ই নাকি মারা গেছে। মরা মানুষটাকে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে হাসপাতালে গেছে। কত বলেছিলাম এই অসুখ নিয়ে যেও না।
ফাতেমা বেগম আবার আচলে মুখ ঢেকে কান্না আরাম্ব করে দিল। চোখের পানি যেন শেষই হচ্ছে না।

রাবেয়াও নিজের কথা তাকে বলে নিজের মনটা হালকা করে। দুজনেরই এখানে আপন কেউ নেই। সেই জন্যই রাবেয়াকে হয়তো সে একটু বেশিই ভালোবাসে।
শুক্রবার তাদের দোকানটি বন্ধ। সেদিন সকালবেলা রাবেয়া নাজমার সাথে দেখা করতে গেল।

এই কদিনে নাজমার চেহারাটাও কেমন যেন পালটে গেছে। যেন চেনাই যাচ্ছে না।
রাবেয়াকে দেখে নাজমা বলল, আমাকে মনে হয় ভুলে গেলি!
- তোমার উপকারের কথা কি কখনো ভোলা যায়!

সেদিন কমলা আন্টিও বাড়িতেই। নাজমার চেয়ে কমলা আন্টিই যেন এখন বেশি পরিচিত হয়ে গেছে। রাবেয়া মনে মনে ভাবে, দূরে থাকলে আসলেই হয়তো বন্ধুত্ব নড়বড়ে হয়ে যায়।

নাজমা রাবেয়াকে বলে, কেমন আছিস রে!
- খুব ভালো আছি। তুই না থাকলে যে আমার কি হত!
- শুনলাম একটা বাসা নিয়েছিস। তা বাজার-সদাই করতে পারিস?
- আগে নিজেই করতাম। এখন ফাতেমা আন্টি করে দেয়। ও! তোকে তো ফাতেমা আন্টির কথা বলতেই ভুলে গেছি। জানিস! খুব যত্ন করে আমার।

রাবেয়া কিছুক্ষন আলাপ-সালাপ করে চলে আসল। সে চিন্তা করেছে আজকের দিনটা একটু বিশ্রামে কাঁটাবে। কমলা আন্টির আজকে ছুটি নেই। সকালেই সে কাজে যাবে। এই ফাকে সে একটু ঘুমুবে। যখন কাজ করে তখন তো শান্তি নেই-ই। বাসায় ফাতেমা আন্টির বকবকানি থেকেও নিস্তার নেই।
....

দেখতে দেখতে আরো এক মাস পার হয়ে গেল। রাবেয়া কিছুদিন ধরে হেঁটে মার্কেটে যেতে পারে না। রিকসায় যেতে হয় তাকে। ফাতেমা আন্টি কিছুদিন ধরে যেন তাকে একটু বেশিই যত্ন করছে। এমন আদর সে আগে মনে হয় কোথাও পায় নি। অনেক শান্তিতে আছে রাবেয়া। কিন্তু তারপরেও কোথাও যেন একটা শুন্যতা কাজ করে রাবেয়ার মধ্যে। রাবেয়া সেটা বুঝতে পারে। ও বুঝতে পারে নিজের আপন বোনটাকে সে এখনো মনে করে। এখানে আসার পর রাজিয়ার সাথে একবারের জন্যও কথা হয় নি। সে কেমন আছে! রাতুল কেমন আছে! রাতুলও কি রাবেয়া আন্টির কথা মনে করে? - হয়তো করে।

রাজিয়াও হয়তো তার ছোট বোনটাকে নিয়ে চিন্তা করে। আর করবেই বা না কেন। তাদের দুজনের ছোটবেলার একসাথে থাকার সৃতিগুলো কি ভুলে যাওয়ার মতো!

কিছুদিন ধরে রাবেয়া একটু হাটাহাটি করলেই হাপিয়ে যায়। কোন এক জায়গায় অনেক্ষন বসে থাকলেও মেরুদণ্ডের হাড় ব্যাথায় টনটন করে। একটানা সেলাই করা কঠিন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।
সেই মেয়েটা মাঝে মাঝে রাবেয়াকে দেখতে আসে। রাবেয়া তার নাম জানতে পেরেছে, মেয়েটার নাম আবিদা। রাবেয়ার কাছে নামটা খুব পছন্দের। যদি রাবেয়ার মেয়ে হয় তাহলে মেয়ের নাম সে আবিদা-ই রাখবে। কিন্তু যদি ছেলে হয়? তাহলে কি রাখা যায়!

ফাতেমা আন্টির কিছুদিন ধরে হালকা জ্বর। রাবেয়া অনেক বলেছে অসুধ এনে খেতে। কিন্তু সে কথাই শোনে না। রাবেয়া কিছুদিন ধরে খেয়াল করছে এলাকার অনেক লোকেরই সর্দি-জ্বর হচ্ছে। মনে হচ্ছে কোন ভাইরাস। অন্য কারো সুরক্ষার বিষয় বাদ দিলেও। নিজেকে তো অন্তত সেফটি রাখতে হবে।

আরো এক মাস পার হয়ে গেল। সময় যেন এখন পানির মতো গড়িয়ে চলছে। তবে রাবেয়া এখন কিছুই করতে পারে না। একটু কোন ভাড়ি কাজ করতে গেলেই মাথা ঘুড়ায় আর বমি বমি আসে। চার মাসের জন্য রাবেরা তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এক মাসের বেতনের টাকা দিয়ে তার থেকে বাসা ভারা দিলে অল্প কয়েকটা টাকা থাকে। সেই টাকা দিয়ে জীবন চালানো অনেক কষ্টের। দুই মাসের বেতনের কিছু টাকা জমা হয়েছিল। ক্রমেই সেই টাকা ফুরিয়ে আসছে। এখন তার কাছে যে পরিমান টাকা আছে তা দিয়ে বড়োজোড় ১৫-২০ দিন চলবে। রাবেয়ার এটাই চিন্তা যে, বাকি মাসগুলোর খরচ সে কিভাবে চালাবে?

ফাতেমা আন্টির কাছে বিষয়টা বলার পর সে একটা চমৎকার সমাধান করে দিল। সে রাবেয়াকে বলল, আমি যা বলছি তাই করবে! তোমার বাসাটি ছেড়ে দাও। আজকে থেকে আগামী চার মাস তুমি আমার কাছেই থাকবে। কি দরকার তোমার বাড়ি ভাড়া দিয়ে অতগুলো টাকা নষ্ট করে। তারচেয়ে তুমি আমার কাছেই থাকো! দুজনে মিলে কোনরকম দিন পার করে দিবো!
আইডিয়াটা রাবেয়ার অনেক পছন্দ হয়। রাবেয়া একসময় ফাতেমা আন্টিকে জড়িয়ে ধরে নিজের অজান্তেই কেঁদে ফেলে। ফাতেমা আন্টি রাবেয়াকে শান্তনা দিয়ে বলল, চিন্তা করো কেন? আমি আছি না! যতদিন আমি আছি তোমার কিছু হতে দেব না। রাবেয়া তাকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

দুজনে ভালোই চলছে। রাবেয়া কাজে একটু একটু সাহায্য করে। আর ফাতেমা আন্টিই সব কাজ করে। রাবেয়া একদিন চিন্তা করল তাকে একবার একটা গাইনী ডাক্তার দেখাতে হবে। সর্বশেষ রায়হান একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর আর যাওয়া হয় নি। কবে যেতে পারবে তারও কোন গ্যারান্টি নেই। হাতে টাকাপয়সা নেই। ডাক্তারের কাছে গেলে যে কি খরচ! রাবেয়া চিন্তা করল একবার সে ফাতেমা আন্টিকে ব্যাপারটা বলবে। কোন একটা উপায় তো সে অবশ্যই বের করবে।
ফাতেমা বেগম রাবেয়েকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। যতই ভালোবাসুক, ফাতেমার আন্টির কাছে কোন টাকাপয়সা নেই। রাবেয়া যখন বলল, আমার একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। অনেকদিন ধরে ডাক্তারের কাছে যাই না। কিছুদিন ধরে শরিরের অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। কথাটা শোনার পর ফাতেমা বেগমের কপালটাতে হালকা ভাঁজ দেখা গেল। যদিও পরে সে বলল, চেষ্টা করে দেখব। রাবেয়া ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে। তাই আর তা নিয়ে কথা আগাল না। বেচারি যে তাকে খায়িয়ে দায়িয়ে এই ঘড়ে থাকতে দিয়েছে এতেই অনেক কিছু। রাবেয়া বুঝতে পারে তার কষ্টটা। এক মাস আগে যে তার হালকা জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বরে ভুগতে ভুগতে একসময় হয়তো টাইফয়েড দেখা দিয়েছিল। কিছুদিন বিছানা থেকে উঠতে পারে নি।

তারপরেও সে একটা অসুধও খায় নি। কারণ তার কাছে কোনরকম দিন পার করার মতো টাকা ছিল। ওসুধ কেনার মত পয়সা তার কাছে ছিল না।

রাবেয়া বুঝতে পারছে তার এসব সহ্য করতে হবে। এই মুহুর্তে যে সে তার বোনের কাছে চলে যাবে তারও কোন সম্ভাবনা নেই। বাপের বাড়ি গিয়ে তো আরো লাভ নেই। তারচেয়ে সে এখানেই ভালো আছে।
কিছুদিন ভালোই যাচ্ছিল। সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকালবেলা হটাৎ করে রাবেয়ার পেঁটের ব্যাথা আরাম্ব হল। প্রচন্ড ব্যাথা। ফাতেমা আন্টি কাজে গেছে অনেক আগে, আসতেও অনেক দেড়ি। রাবেয়া ভাবল এভাবে আর বসে থাকলে চলবে না। কিছু একটার ব্যাবস্থা তাকে করতেই হবে। এই সময় আর কার সাহাজ্য পেতে পারে। আশেপাশে জানাশোনা কেউ নেই। ইস! একটা যদি মোবাইল থাকত। অন্তত ফোন করে নাজমা বা আবিদার খোজখবর নেওয়া যেত। রাবেয়ার বাবার একটা মোবাইল ছিল। সেটা বাবা মারা যাওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে হয়তো। কিন্তু এখন মোবাইল কেনার টাকা কোথায়। তাছাড়া নাজমার কাছেও মোবাইল নেই। তবে আবিদার কাছে একটা আছে। কিন্তু সেটার নাম্বার তার জানা নেই। বাইরের অনেক লোকের কাছে হয়তো মোবাইল আছে। তাদেরটা দিয়েও নাহলে ফোন করা যেত।
কোনমতে উঠে গিয়ে গায়ের উড়নাটা ঠিক করে ব্যাগের ভেতর থেকে কিছু টাকা বের করে বাইরের দিকে রওনা হল। বাইরে প্রচন্ড রোদ। বৃষ্টির কোন দেখাসাক্ষাত নেই। এই প্রচন্ড গরমের মধ্যে রাবেয়া বাইরে রাস্তার পাশে গেল। একটা ছাতা কিনতে চেয়েছিল রাবেয়া। কিন্তু পরে আর তার কোন প্রয়োজন হয়নি বলে তা আর কেনা হয় নি।
রাবেয়া একটা রিকসা থামাল। রিকসাওয়ালা প্রথমে সেদিকে যেতে চাইল না। অনেক কাকুতি মিনতির পর শেষমেষ রাবেয়ার শারিরিক অবস্থা দেখে রাজি হল।
- একটু দ্রুত চালান ভাই।
রিকসাওয়ালা নিজের সকল শক্তি সামর্থ দিয়ে পেডেল চালিয়ে যাচ্ছে। রাবেয়া যেন আর কিছুতেই ব্যাথা সহ্য করতে পারছে না। রিকসার ঝাপিটা মাথার উপরে টেনে নিল সে।

এমনিতে যেতে রাবেয়ার সামান্য সময়ই লাগে। কিন্তু আজকে এই মূহুর্তে যেতে যেন অনেক সময় লাগছে। কোনক্রমেই যেন রাস্তা শেষ হচ্ছে না। কাতর গলায় রাবেয়া আবার বলল, তারাতারি যান ভাই।
- এইতো আর ইকটু! মাত্র পাঁচ মিনিট। রাবেয়ার কাছে এখন এই পাঁচ মিনিটকেই পাঁচ ঘন্টার মতো মনে হচ্ছে।

অবশেষে রাবেয়া মার্কেটের সামনে এসে পৌছাল। রিকসা থেকে কোনমতে নেমে মার্কেটটার ভেতরে ঢুকল। ভেতরে হয়তো কমলা আন্টি আছে তা না হলে আবিদা আছে। কাউকে না কাউকে তো পেয়েই যাবে। ব্যাথা যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিশাল মার্কেটের মধ্যে উপরের তলায় সিড়ি দিয়ে উঠা আরো মুশকিল। কিন্তু বিপত্তি একসময় একটা বাঁধল। সিড়িতে যেই উঠতে যাবে, ধপাস করে মাথা ঘুড়ে নিচে পড়ে গেল। মাথার মধ্যে প্রচন্ড একটা আঘাত পেল রাবেয়া। আস্তে আস্তে চোখ বুঁজে আসতে লাগল। চারিদিকের সবকিছু ঝাপসা ঝাপসা হতে

লাগল। তারপর তার সাথে আর কি হল তা তার খেয়াল নেই।

রাবেয়ার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে কোথায় আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। প্রচন্ড মাথাব্যাথা করছে। রাবেয়া বুঝতে পারছে আশেপাশে অনেক আলো! এটা কোন জায়গা? রাবেয়া একসময় খেয়াল করল তার পেটের ব্যাথা কমে গেছে। আজব! একটু ব্যাথাও করছে না!
চেতনা আসলে রাবেয়া খেয়াল করল সে একটা হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। হাত নাড়াতে গিয়ে রাবেয়া হালকা একটু ব্যাথা পেল। বুঝতে পারল হাতের মধ্যে স্যালাইন পুশ করা হয়েছে। কতক্ষন শুয়ে ছিল তার খেয়াল নেই। কিছুক্ষন পর একটা মেয়ে এসে খেয়াল করল রাবেয়ার জ্ঞান ফিরেছে। নার্স মেয়েটি কাছে এসে রাবেয়াকে হালকা গলায় বলল, এখন কেমন লাগছে আপনার?
রাবেয়াও নরম গলায় বলল, ভালো!
- আপনার শরির তো অনেক দুর্বল। এই সময় ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করতে হবে। আপনি যদি নিজেই দুর্বল থাকেন, বাচ্চার তাহলে কি অবস্থা হবে, হ্যা?

রাবেয়া আসলেই আগের চেয়ে অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। নিজের চেহারার দিকে তাকালে এখন নিজেরই লজ্জা করে। শরির শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রাবেয়ার চেহারা আগে কত সুন্দর ছিল। এখন আয়নায় নিজের মুখ দেখলে কান্না চলে আসে। আয়নার দিকে আর তাকাতেই ইচ্ছে হয় না।

নার্স মেয়েটা রাবেয়ার আরো কাছে এসে বলল, আপনার সাথে দুজন মহিলা দেখা করতে এসেছে। তাদেরকে কি ডেকে দিব? রাবেয়া হালকা করে মাথা ঝাকিয়ে হ্যা জবাব দিল। নার্স মেয়েটা বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষন পরে রুমের ভিতর দুজন মেয়ে আসল। রাবেয়া দেখল আবিদা আর নাজমা এসেছে। নাজমা কান্না করতে করতে তার কাছে এসে বলল, রাবেয়া! কেমন আছিস তুই! তোর শরির খারাপ আমাকে আগে বলিস নি কেন?
নার্স মেয়েটা নাজমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, এক্সকিউজ মি! জোরে কথা বলবেন না প্লিজ! রোগীর কষ্ট হবে।

নাজমা আর জোরে কথা বলার চেষ্টা করল না। সে আস্তে করে রাবেয়াকে বলল, এখন কেমন লাগছে?
- ভালো।
বিকালের দিকে ডাক্তার আসলেন। ডাক্তার রাবেয়াকে দেখেই বলল, এতো দুর্বল থাকলে চলবে? শরিরের সব পুষ্টি উপাদান এখন বেশি বেশি থাকতে হবে। আর রেষ্টে থাকবে। বেশি কঠিন কাজ করবেনা। আবার এক্কেবারে শুয়ে বসেও থাকবে না। হালকা কাজ করবে। আর মাঝে মাঝেই কিন্তু চেকাপ করাতে আসবে। ঠিক আছে।
রাবেয়া বলল, আসব।

সন্ধ্যার দিকে রাবেয়ার হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে গেল। যাওয়ার আগে ডাক্তার কিছু

প্রিস্ক্রিপশন করে দিল। আর বলল, তোমার শরিরে ক্যালসিয়ামের খুব ঘাটতি আছে। এখন যদি তার ঘাটতি না কাঁটাতে পার, তাহলে বাচ্চা কিন্তু হাড়ের নানান সমস্যা নিয়ে জন্মাবে। বুঝেছ? তাই যত তারাতারি পার ক্যালসিয়ামের অভাব দূর করতে হবে। এখন আসতে পার। যদি আবার কোন সমস্যা হয় তাহলে আমাকে দ্রুত জানাবে।

আবিদা অনেক আগেই চলে গেছে। তবে নাজমা আছে। নাজমা বলল, চল তোকে পৌছে দেই! রাবেয়া না করল না। বলল, চল যাই।
- সাবধানে আয়।
- এই! আমার কাঁধে না ব্যাগ ছিল, সেটা কোথায়?
- কিসের ব্যাগ? আমি তো দেখি নি!
- তাহলে কেমন হবে। ব্যাগের মধ্যে যে কিছু টাকা ছিল।
- চিন্তা করতে হবেনা। আমি মজা করছিলাম। তোর ব্যাগ আমার কাছেই আছে।

বাসায় যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই প্রথম নাজমা রাবেয়ার বাসায় আসল। ফাতেমা আন্টি আজকে এখনো ফেরেনি। রাবেয়া নাজমাকে বলল, এখনি যাস না। কিছুক্ষন পর ফাতেমা আন্টি চলে আসবে। দেখা করে যাস। ফাতেমা আন্টিও তোকে খুব দেখতে চায়।
- ঠিক আছে, গেলাম না। কিন্তু বেশি রাত হয়ে গেলে যে বিপদ। বাড়িতে পৌঁছাতে পারব না।
- যেতে না পারলে আমাদের এখানে থেকে যাবি।
- তা হবে না বোন। বাড়িতে বাবার শরির ভালো না। আম্মার আসতে আরো রাত হবে। তাদের ছেড়ে থাকতে পারি না।

নাজমাকে শান্ত গলায় রাবেয়া বলল, তোর বাবা-মাকে তুই অনেক ভালোবাসিস, তাই না?
নাজমা বুঝতে পারছে রাবেয়া এখন তার বাবা-মাকে খুব মিস করছে। নাজমা শান্ত গলায় বলল, হ্যা। অনেক ভালোবাসি। তাদের ছাড়া দুনিয়াতে তো আমার আর কেউ নেই।
- জানিস? রাতের বেলা আমার বাবা যখন কাজে থেকে বাসায় ফিরত, আমার জন্য প্রতিদিনই কিছু না কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসতই। যদি দেখেছি কোন চাপের কারণ বাবা কিছু আনতে পারে নি। তাহলে বাবার সাথে রাগ করে বসে থাকতাম। বাবা রাতের বেলা গোছল করতেন। কিছু না আনলে সেদিন বাবাকে রাগ করে গোছলের পানি দিতাম না। এতে কিন্তু বাবা মোটেও রাগ করত না। বলত, কালকে বেশি কিছু কিনে আনব। আজ অমুক কারণে আনতে পারি নি। কিন্তু তবুও আমি রাগ কমাতাম না। আমি মনে মনে বাবাকে, খারাপ বাবা, পচা বাবা বলে গালি দিতাম।
তখন তো বুঝি নি। আমার জন্য বাবা কত কিছু করেছেন। নিজের জন্য কিছু না কিনে আমার জন্য কিনেছেন। একদিন খাবার জীনিস আনতে না পারলে আমি কষ্ট পেতাম। কিন্তু বাবার ভেতরটাও যে কষ্টে কুড়ে কুড়ে খেত তা আমি জানতাম না। মা মারা যাওয়ার পর বাবা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আমার কষ্ট হবে বলে বাবা আমাকে একটা ভালো ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দিল।
বাবাকে অনেক বলেছি, আরেকটা বিয়ে করে ফেল তাহলে। বাবা করে নি। কেন করে নি, তা

যদি আগে জানতাম বাবাকে এরকম মরতে দিতাম না।

নাজমা খেয়াল করল রাবের চোখ আস্তে আস্তে ভিঁজে যাচ্ছে। নাজমা রাবেয়ার পাশে এসে বলল, থাক! যা হয়ে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে আর লাভ কি। তুই দেখিস সব কিছু আবার ঠিক হয়ে যাবে। আল্লাহ কাউকেই একেবারে কষ্টে রাখে না। আবার একেবারে শান্তিতেও রাখে না। সবাই শান্তিতে থাকলে মানুষ একসময় খোদাকে ভুলে যাবে। তার আদেশ কেউ মানবে না। তাই আল্লাহ মাঝে মাঝে পরিক্ষা করে। ইচ্ছা করে বিপদে ফালায়। দেখে, সে কতটা সবর করতে পারে।
 তুই চিন্তা করিস না। আল্লাহর কাছে দোয়া কর। ধৈর্য রাখ। দেখবি একসময় সব ঠিক হয়ে যাবে।

একসময় ফাতেমা আন্টি আসল। নাজমাকে দেখে সে অনেক খুশি। রাবেয়া যে অসুস্থ সেটা ফাতেমা আন্টি জানে না। নাজমা যখন ফাতেমা আন্টিকে সব খুলে বলল সে অবাক হয়ে গেল। রাবেয়ার এতো কিছু হয়ে অথচ সে নিজে কিছুই জানে না।
নাজমা বলল, এখন চিন্তা করার কিছুই নেই। কিছু অসুধ কিনে দিয়েছি। সেই অসুধগুলো নিয়মিত খেলেই আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।
ফাতেমা আন্টি নাজমাকে বলল, তুমি আজ যা করলে তার ঋণ আমি কখনো শোধ করতে পারব না। রাবেয়ার কিছু হয়ে গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।
- রাবেয়া আমার ছোট বোনের মত। ওকে বিপদ থেকে রক্ষা আমার দায়িত্ব।
- শুনে ভালো লাগল। তা আজকের রাতটা থেকে যাও।
- না আন্টি। কোনভাবেই পারব না। বাবা-মা ঘড়ে একা। তাদের ছাড়া থাকতে পারি না। তবে দিনের বেলা সময় করে একদিন আপনার বাড়িতে আসব।
নাজমা সেদিন চলে গেল। নাজমা যাওয়ার পর ফাতেমা আন্টি বলল, এখন শরির কেমন লাগছে?
- ভালো।

....
রাবেয়া কিছুদিন ধরে খেয়াল করছে ফাতেমা আন্টির মনটা কিছুদিন ধরে ভালো নেই। এমনিতে ফাতেমা আন্টির বকবকানির জন্য ঘড়ে থাকা দায়। কিন্তু ইদানিং রাবেয়া দেখছে ফাতেমা আন্টি তার সাথে দরকারি কথা ছাড়া আর কোন কথাই বলে না। রাবেয়ারও এমন অবস্থা হয়েছে যে তার বিষয়টি জানতেও সাহস হয় না।
রাবেয়া একসময় ভাবে, আচ্ছা! মহিলাটি কি রাবেয়াকে সব মনের কথা বলে ফেলেছে? যে-তার কাছে এখন আর বলার মতো কিছু নেই।

এটা দুনিয়ার নিয়ম। একজন মানুষ কারো কাছে প্রথম প্রথম খুব আদরে থাকে। দিন যত যাবে, সেই আদরের পরিমান তত কমতে থাকবে। ফাতেমা আন্টি প্রথম তাকে অনেক আদর করেছে। এখন সেটা কমে যাওয়া স্বাভাবিক।

রাজিয়াদের বাড়িতেও তো রাবেয়া প্রথমে অনেক আদরে ছিল। সময়ের পরিক্রমায় সেই আদর আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল। একসময় সংসারে রাবেয়া হয়ে গেল একটা বোঝা। রাবেয়া চিন্তা করে, ফাতেমা আন্টিও কি একসময় তাকে সংসারের বোঝা মনে করবে? তখন কি হবে?

কিছুদিন ওসুধ খাওয়ার পর রাবেয়ার একটু উপকার হয়েছে। এখন যেন নিজেকে একটু হালকা মনে হয়।

এই কদিনে তেমন কিছু হয় নি। তবে রাবেয়া খেয়াল করছে ফাতেমা আন্টির শরির আস্তে আস্তে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা কাজ করতে যায় আর রাতের দিকে ফিরে আসে। ফিরে আসার পর ফাতেমা আন্টি রাবেয়ার সাথে বেশি কথা বলে না। চুপ করে থাকে। রাবেয়া একবার বলেছিল, তোমার কি শরির খারাপ নাকি?
- শরির ভালো।
- তোমাকে আগের চেয়ে অনেক দুর্বল লাগছে। আমাকে বলো কিসের সমস্যা তোমার!
ফাতেমা আন্টি বলে না। শুধু বলে, তুই শুধু শুধু কেন চিন্তা করছিস? আমার কিচ্ছু হয় নি।

কিন্তু রাবেয়া যে বুঝতে পারে সে কিছু কথা লুকাচ্ছে। তার মুখ একধরনের কথা বললেও দুটি চোখ ভিন্ন কথা বলে। চিন্তা না করে কি থাকা যায়?

....
কিছুদিন কোনরকম চলছিল। দিনের বেলা একা একা ভাল্লাগে না রাবেয়ার। বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগে। কিছুদিন ধরে নাজমাও খোজখবর নিচ্ছে না। কমলা আন্টিও না। রাবেয়া ফাতেমা আন্টিকে একবার বলেছিল, তুমি চলে গেলে আমার এই ঘড়ে একা একা ভয় লাগে।
ফাতেমা আন্টি শুধু বলেছিল, "কিচ্ছু হবে না, কিসে ভয়?"

রাবেয়া পেঁটের বাচ্চার বয়স এখন আট মাস। ফাতেমা আন্টি আজকে কাজে গেল অনেক সকাল বেলা। রাবেয়া ঘুম থেকে উঠে দেখে ফাতেমা আন্টি নেই। রাবেয়া চিন্তায় পরে গেল। সে তো এতো আগেই কোনদিন কাজে যায় না। এখনো রাবেয়া নিজেই রান্না করতে পারে। ঘড়ে শুধু রাতের রান্না করা ভাত। কোন তরকারি নেই।
ভাতটা একটু গরম করে রাবেয়া তরকারি বসিয়ে দিল।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে রাবেয়া বসে রইল। প্রতিদিন যা করে আজকেও তাই করছে রাবেয়া। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু তার সাথে চিন্তা যোগ হল রাতের বেলা। এই সময় তো ফাতেমা আন্টির ফিরে আসার কথা।

ফাতেমা আন্টি সকালে না হয় আগে আগে বের হয়েছে, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এখন এতো দেরি করছে কেন? রাবেয়ার বড্ড ভয় করতে লাগল। এখানকার রাস্তাঘাট রাতের বেলা অতটা নিরাপদ না। ফাতেমা আন্টির কিছু হয়ে যায় নি তো?

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠে রাবেয়ার।

বাসার দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল এখন সাড়ে দশটা বাঁজে। এমনিতে আন্টি আটটার দিকেই তো ফিরে আসে। এখনো আসেনি মানে কিছু না কিছু একটা বিপদ অবশ্যই হয়েছে। নাহ্! আর অপেক্ষা করতে পারছে না রাবেয়া। ঘুমে চোখ নেতিয়ে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে বাইরে গিয়ে খোজখবর নিতে। কিন্তু সেই অবস্থা রাবেয়ার এখন নেই। হাটাহাটি করতে একদমই ইচ্ছে করে না। রাতের বেলা অপেক্ষা করতে করতে রাবেয়া কখন যে ঘুমিয়ে গেছে তার টেরই সে পায় নি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রাবেয়া দেখে ফাতেমা আন্টি তার মাথার কাছে বসে আসে। আন্টি মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। রাবেয়া উঠতে গিয়েও উঠল না। ভাবল, উঠলে হয়তো আন্টি হাত বুলানো বন্ধ করে দিবে। তাই সে চুপচাপ শুয়ে রইল। ফাতেমা আন্টিও আদরের সাথে হাত বুলিয়েই যাচ্ছে।
ইস! আন্টি কত সুন্দরভাবে হাত বুলাতে পারে!

রাবেয়া নরম গলায় ফাতেমা আন্টির দিকে তাকিয়ে বলল, আন্টি! রাতে এতো দেরি করলে কেন? কোথায় গিয়েছিলে?
- কোথায় আর যাব। তোকে ছেড়ে তো কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।
- আচ্ছা! তুমি আমার সাথে এতো কম কথা বলো কেন এখন?
আন্টির মুখে এখনো হাসি। সেই হাসি মুখেই আন্টি বলল, আমি যে এখন তোর উপরে বড্ড বিরক্ত হই। তোকে এখন আমার দেখতেই ইচ্ছা করে না।
- মজা করছ?
- হয়তো।
রাবেয়া এক দৃষ্টিতে আন্টির দিকে তাকিয়ে আছে। আন্টির চেহারা থেকে বিরক্তির ছাপ চলে গেছে। তার পরিবর্তে মুখের মধ্যে একটা মায়া মায়া ভাব চলে এসেছে। আচ্ছা! ফাতেমা আন্টি কি রাবেয়াকে সম্মোহিত করছে? রাবেয়া কি আস্তে আস্তে ফাতেমা আন্টির বশীভূত হয়ে যাচ্ছে? রাবেয়া একসময় খেয়াল করল ফাতেমা আন্টির মুখ থেকে খুশির আভা বিদেয় হয়ে আস্তে আস্তে বিষাদের ছায়া নামছে। কিন্তু কেন?
এমন সময় রাবেয়া আঁতকে উঠল। সে "আন্টি!" বলে একটা চিৎকার দিল। রাবেয়া দেখতে পাচ্ছে ফাতেমা আন্টির গায়ে থেকে এক ধরনের সাদা ধোয়া বের হচ্ছে। আর তার সাথে ফাতেমা আন্টির শরির যেন আস্তে আস্তে হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে। রাবেয়া উঠতে গিয়েও সে দেখল তার হাত পা কাজ করছে না। কোন অদৃশ্য শক্তি যেন তার হাতে পায়ে চাপ দিয়ে ধরে রেখেছে।
আন্টির মুখ থেকে "আহ" টাইপের আর্তনাদ শোনা গেল। দেখতে দেখতে ফাতেমা আন্টির পুরো শরির অদৃশ্য হয়ে গেল। রাবেয়া শুধুই এসব শুয়ে থেকে দেখছিল।

ঘড়ের মধ্যে আবার আগের মতো নিরবতা। হটাৎ রাবেয়া চোখ মেলে তাকাল। হাত পায়ের

শক্তি আবার ফিরে আসছে। রাবেয়া ফাতেমা আন্টির জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে গিয়েছিল। আর ঘুমিয়েই সে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছিল। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত তিনটা বাজে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল এখনো ফাতেমা আন্টি বাসায় আসে নি।
বিছানা থেকে উঠে পড়ল রাবেয়া। বাইরে গেল। বাইরেও নেই। বাথরুমের দরজাও খোলা। ভেতরে নেই। তারমানে তো ফিরে নি। রাবেয়া এখন পুরোপুরি ভাবে নিশ্চিত হল আন্টর কিছু না কিছু একটা বিপদ অবশ্যই হয়েছে।

বাইরে এখনো কয়েকটা ঘড়ে বাতি জ্বলছে। তবে বেশিরভাগ জায়গাতেই অন্ধকার। টর্চ লাইটটাও কিছুদিন ধরে সমস্যা করছে। আলো নিভু নিভু করে জ্বলে। বড্ড চিন্তা হতে লাগল রাবেয়ার। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছু করতে পারছে না।

রাবেয়া বিছানায় এসে বসল। কিচ্ছু ভাল্লাগছে না। চিন্তায় ঘুম এক্কেবারে উধাও হয়ে গেছে। রাবেয়া চিন্তা করল সকাল হলেই বাইরে একবার খোঁজখবর নিতে হবে।
তাছাড়া এমনো তো হতে পারে যে, আন্টি কোন আত্বীয়র বাসায় গেছে। আসতে দেড়ি হয়েছে বলে রাতটা সেখানেই কাঁটাচ্ছে।
কিন্তু রাবেয়াকে একলা ঘড়ে রেখে আন্টির তো কোথাও যাওয়ার কথা না।

চারটা বাজে। একটু পরেই ফজরের আজান হবে। আজকে রাতে আর ঘুম আসবে না। রাবেয়া ভাবল, জেগেই যখন আছি! তাহাজ্জুদের নামাজটা পড়ে ফেললে কেমন হয়!

সকাল হয়ে আসছে। ফজরের নামাজ পড়ে রাবেয়া আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করে বলল, আল্লাহ! আন্টি যেখানেই থাকুক। তুমি তাকে তোমার হেফাজতে রেখো।

একটু বেলা হলেই রাবেয়া বাইরে খোঁজ নেওয়ার জন্য গেল। পাশের একটা ঘড়ে আমিরুল চাচার সাথে রাবেয়ার পরিচয় আছে। সকালবেলা আমিরুল চাচার কাছে সব ব্যাপারস্যাপার খুলে বলল। আমিরুল চাচা বলল, বলিস কিরে! রাতে বাড়ি ফেড়ে নি?
- না। কালকে সকাল বেলায়ও অনেক আগেই ঘড় থেকে বের হয়ে গেছে। খেয়েও যায় নি।
- এটা তো তাহলে চিন্তার বিষয়। আচ্ছা! ফাতেমা যেখানে কাজ করে সেই বাসার ঠিকানা জানিস?
- জানি না চাচা। আন্টি কোনদিনই আমাকে বলে নি।
- বড্ড চিন্তায় ফালালি আমাকে। আচ্ছা! তোর কাছে কি ফাতেমার কোন ছবি আছে?
- না।
- তাহলে কি করা যায়?
- চাচা- তুমি কিছু একটা কর। আন্টির কিছু হয়ে গেলে আমাকে দেখার কেউ নাই।
- চিন্তা করিস না। আল্লাহ আছে না? আমি যখন কাজে যাব। তখন আশেপাশে খোঁজখবর নিয়ে আসব। আর তুই ঘড়েই থাকিস। বাইরে যেন বের হোস না।

ঘড়ে বসে থাকতে থাকতে ফাতেমা বড্ড বোর হয়ে যাচ্ছে। আপন মানুষের খোঁজ না পেলে কি ঘড়ে বসে থাকা যায়? রাবেয়া চিন্তা করল সে বের হবে। বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে। তবে সমস্যা হল, নিজের কাছে একটা পয়সাও নেই, যেটা দিয়ে একটা রিকশা নিতে পারবে।
যাই হোক। রাবেয়া আজকে হেঁটেই যাবে। কোন অসুবিধা হবে না।

সত্যিই যদি রাবেয়ার কাছে ফাতেমা আন্টির একটা ছবি থাকত তাহলে খুব ভালো হত। এতো বড় শহরে একা সে কিভাবে একটা মানুষকে খুজে বেড়াবে। শহরে হাজার হাজার অলিগলি। তারচেয়ে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা অনেক সহজ। রাবেয়া আশেপাশের দোকানগুলোতে খোঁজ নিয়েছে। ৩০-৪০ বছরের একটা মহিলা। শ্যামলা, আর গায়ে একটা কালো রঙের শাড়ি।
এরকম মানুষ তো অহরহ দেখা যায়। আশেপাশের লোকজন কয়জনকেই আর খেয়াল করবে। কেউ যদি দেখেও থাকে তবেও কারো সেই চেহারা মনে থাকবে না।

কিন্তু রাবেয়া থামল না। অনেক জায়গায় খবর নিতে লাগল। রাবেয়া জানে এভাবে খবর নিয়ে কোন লাভই হবে না। পুলিশের কাছে জানিয়ে কোন লাভ হবে কি?
কিন্তু পুলিশকেই বা সে কি বলবে? আন্টির বিশেষ কোন তথ্যই তার কাছে নেই।
একটা লোকের কাছে থেকে রাবেয়া থানার ঠিকানাটা নিল। থানা এখান থেকে অনেক দূর। রাবেয়া যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। রাবেয়া ভাবল, এইভাবে হেঁটে হেঁটে খোজার চাইতে থানায় গেলেই লাভ হবে।

টানা এক ঘন্টা ধরে রাবেয়া হাঁটছে তো হাঁটছেই। সুর্যটা আস্তে আস্তে মাথার উপরে উঠে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটের মানুষ আস্তে আস্তে কমে আসছে। শত শত বাস ট্রাক ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলছে রাস্তা দিয়ে। আজকে আবার সেই মাস্কের কথা মনে হল। প্রথম যেদিন এসেছিল, সেদিন মাস্ক কেনা হয়েছিল না। গাড়ির ধোঁয়ায় নাক জ্বলছে রাবেয়ার। আর একটু পথ যেতে হবে তাকে। কিন্তু সেই রাস্তাটাই এখন তার কাছে বিশাল মনে হচ্ছে।

আর কিছুক্ষন পর রাবেয়া পৌঁছে গেল থানায়। সেখানে গিয়ে সে দেখল তারা সবাই দুপুরের খাবার খাচ্ছে। একজন পুলিশ বলল, আগে খাওয়া শেষ করে নেই। তারপর রিপোর্ট লেখা হবে। অগত্যা রাবেয়া থানার পাশে বাইরের ব্রেঞ্চটাতে বসল। সকালবেলা কিছুই খায় নি রাবেয়া। দুপুর হয়ে গেছে। এই বেলাও খাওয়া হল না। কিছু যে কিনে খাবে সেই উপায়ও নেই। পুলিশের লোকগুলো খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে হাসাহাসির শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এরা খাওয়ার চেয়ে কথা বলছে বেশি।

আরো আধ ঘন্টা পরে একজন রাবেয়াকে বলল, ভেতরে আসুন। একজন পুলিশ তাকে তার বিপরীত পাশের চেয়ারটাতে বসতে বলল। রাবেয়া চেয়ারে বসল। সেই পুলিশটা বলল, সমস্যা কি আপনার?
- একটা মিসিং রিপোর্ট করতে এসেছি।
- কিসের?

- গত রাতে আমার এক আন্টি কাজের জন্য বাইরে গেছে। সেখান থেকে আর ফিরে আসে নি।
- নাম কি আপনার?
- মোছাম্মত রাবেয়া আক্তার।
- বয়স?
- ১৭ বছর।
- থাকেন কোথায়?
রাবেয়া নিজের বাসার ঠিকানা বলল। আর সেই লোকটা একটা ফরমের মধ্যে সব কিছু লিখে রাখছে।
- আপনার আন্টির নাম কি?
- ফাতেমা বেগম।
- বয়স?
- ৩৫-৩৬ বছর হতে পারে।
- কেথায় কাজ করে?
- আমি সেই ঠিকানা জানি না।
লোকটা চোখ বড় করে বলল, আপনার আন্টি কোথায় কাজ করে সেটাও জানেন না! আচ্ছা- বাদ দেন। তার কি কোন ছবি আছে?
- না, নেই।
লোকটা রাগের স্বরেই বলল, কিছুই যখন জানা নেই তাহলে রিপোর্ট করতে এসেছেন কেন? তাকে এখন কোথায় গিয়ে খুঁজব?
আচ্ছা! তার কাছে কি কোন মোবাইল আছে?
রাবেয়া মাথা নিচু করে বলল, না।

পুলিশের লোকটা আরো রেগে গিয়ে বলল, পাগল নাকি! কোত্থেকে যে আসে এগুলো! কোন ইম্পর্টেন্ট তথ্য নাই, এইগুলা দিয়ে নাকি লোক খোঁজা যাবে।
- আমার আর কিছু জানা নেই। কিন্তু তাকে খুঁজে না পেলে অনেক বড় সমস্যা হয়ে যাবে।
- তাহলে আপনিই বলুল, আমরা এখন কিভাবে তাকে খুজে বের করতে পারি?
রাবেয়া তাদের উত্তরটা দিতে পারল না। শুধু করুন স্বরে বলল, প্লিজ...

লোকটার মেজাজ অনেকটা গরম হলেও সে নিজেকে কন্ট্রেলে রেখে রাবেয়াকে বলল, আপনি যখন এতো করে বলছেন, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদি কেউ ফাতেমা নামের মেয়ের খোঁজ পেয়ে থাকে তাহলে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যাবে। আপনার মোবাইল আছে?
- না।
লোকটা মুখে আরেকটু বিরক্তি লক্ষ করা গেল। তারপর সে বলল, আপনার ঠিকানায় যোগাযোগ করা হবে।
আচ্ছা! আপনার আন্টির গায়ে কেমন ধরনের কাপড় ছিল? নাকি সেটাও জানেন না।

- জানি। গায়ে একটা কালো কালারের শাড়ি ছিল। নতুন না, পুরোনো।
- ঠিক আছে। আপনি এখন আসতে পারেন। খোঁজ পেলে আপনার ঠিকানায় যোগাযোগ করা হবে।
- দেখবেন কিন্তু!
- বললাম তো দেখবো।

রাবেয়া থানা থেকে বের হয়ে এল। শরির দুর্বল হয়ে গেছে। পা চলছে না। যেই পথ ধরে রাবেয়া এসেছে, এখন আবার সেই পথ দিয়েই চলে যেতে হবে। এই মূহুর্তে এতোটা পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব কিনা তা রাবেয়া জানে না। রোদের তিব্রতা আরো বেড়েছে। তারমধ্যে ক্ষুধায় পেটের মধ্যে থেকে গর গর আওয়াজ আসছে। একটু পানি খেতে পারলেও অনেক উপকার হতো।
রাবেয়া একটা দোকান থেকে একটু পানি চেয়ে নিল। এখনো অনেক পথ বাকি। এই বাকি পথ রাবেয়া কেমন করে যাবে সেই চিন্তাই হচ্ছে।
রাবেয়া রওনা দিল।

রাবেয়ার খুব কান্না করতে ইচ্ছা করছে। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, আন্টি তুমি কোথায়? আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় চলে গেলে? আমার ডাকে প্লিজ সাড়া দাও!
আশেপাশে অনেক লোকজন। ইচ্ছে হলেও রাবেয়া সেভাবে ডাকতে পারবে না।
যাওয়ার সময়ও রাবেয়া কয়েকজন লোককে জিজ্ঞেস করল ফাতেমা আন্টির কথা। কিন্তু উত্তর একই। ফাতেমা আন্টির সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না।

একসময় রাবেয়া খেয়াল করল তার শরির অনেক দুর্বল হয়ে গেছে। পিঠের মধ্যে ব্যাথা করছে। পেটেও হালকা ব্যাথা শুরু হয়েছে। কিন্তু রাবেয়া এখনো অর্ধেক পথও আসতে পারে নি। আর বাকি পথ কেমন করে যাবে সেটা চিন্তা করতে করতেই রাবেয়া খেয়াল করল, সে চোখে সবকিছু অন্ধকার দেখছে। কেউ যেন মাথার মধ্যে জোরে চাপ দিচ্ছে। তারপর রাবেয়ার আর কিছু মনে নেই। রাস্তার পাশেই ধপাস পরে পরে গেল রাবেয়া।
....

রাবেয়ার যখন জ্ঞান আসল তখন রাবেয়া দেখল সে একটা ঘড়ের মধ্যে। রাবেয়া আশেপাশে তাকিয়ে দেখল যে চারদিক থেকে অনেক শব্দ আসছে। বাচ্চাদের চিল্লানোর শব্দ। মনে হচ্ছে অনেকগুলো বাচ্চা একসাথে খেলাদুলা করছে। সেই শব্দ কানে এসে চিনচিনে একধরনের ব্যাথা সৃষ্টি করছে।
একটা বাচ্চা মেয়ে রাবেয়ার আছে আসল। চেখের দিকে তাকিয়েই আপা আপা ডাকতে ডাকতে চলে গেল।
মেয়েটি দুরে গিয়ে তার সেই আপুকে বলল, আপা! মেয়েটার জ্ঞান ফিরেছে।
সাথে সাথেই রাবেয়ার দিকে একটা মধ্যবয়সী মহিলা ছুটে আসল। রাবেয়ার পাশে বসে বলল, এই মেয়ে! তোমার নাম কি? রাবেয়ার গায়ে উঠার শক্তিটুকুও তখন নেই। রাবেয়া মধ্যবয়সী

মহিলাটিকে বলল, কিছু খেতে দিন প্লিজ...
মহিলাটা সেই বাচ্চা মেয়েকে বলল, এই! মাছের তরকারি দিয়ে এক প্লেট ভাত আন তো। আর সাথে এক জগ পানি নিয়ে আসিস।

মহিলাটা রাবেয়ার পাশে বসল। আর বলল, তা তোমার নাম কি?
- রাবেয়া।
মহিলাটা রাবেয়াকে আর কোন প্রশ্ন করল না। হয়তো মহিলাটি বুঝতে পারছে যে রাবেয়া অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে।
কিছুক্ষন পরে সেই মেয়েটি ভাত নিয়ে আসল। সাথে পানি। রাবেয়ার সামনে দিলে সে সেগুলো খাওয়া আরাম্ব করল। টানা ছয় সাত দিন একজন লোক খাবার না পেলে যেভাবে খায়, রাবেয়াও ঠিক সেভাবে খাচ্ছে। খাওয়ার সময় রাবেয়ার আর অন্য কোন ধরনের খেয়াল ছিল না।

খাওয়া শেষ করে রাবেয়া সেই মহিলাটাকে একটা ধন্যবাদ দিল। মহিলাটা তখন রাবেয়াকে প্রশ্ন করে বলল, তুমি কোথা থেকে এসেছো?
রাবেয়া তখন সেই মহিলাটিকে সব কথা খুলে বলল। হয়তো মহিলাটি তার কথা শুনে একটু মন খারাপ হল।
মহিলাটা তখন রাবেয়াকে বলল, আমার নাম নাসিমা। এই আশ্রমটা আমি চালাই। যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে আমার এখানে চলে আসবে। আমি দোয়া করি যাতে তোমার আন্টিকে তারাতারি খুজে পাও।

জায়গাটা রাবেয়ার অনেক পছন্দ হল। চারদিকে অনেক ছেলেমেয়ে। হয়তো তাদেরও রাবেয়ার মত বাবা-মা নেই। কিন্তু তবুও সেই ছেলেমেয়েগুলো দিব্বি শান্তিতে আছে। মাঝে মাঝে রাবেয়া ভাবে এই পানসে জীবন থেকে সে কবে মুক্তি পাবে?

নাসিমা রাবেয়াকে কিছু টাকা দিয়েছে। যাতে রাবেয়া একটা রিকসা ভাড়া করে যেতে পারে। রাবেয়া নিজের বাসায় এসেও আবার কিছুক্ষন ফাতেমা আন্টিকে খোঁজার চেষ্টা করল। কিন্তু এতে কোন লাভ হল না। ফাতেমা আন্টি এখনো বাসায় ফেঁরে নি। রিকসা ভাড়া দিয়ে রাবেয়ার কাছে আরো কিছু টাকা বেঁচে গেছে। তাই রাবেয়া চিন্তা করল, নাজমার কাছে যেতে পারলে কেমন হয়!
এখন বিকাল হয়ে এসেছে। আজকে সারাদিন নিজের উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। ইচ্ছে করলেও রাবেয়া আজকে নাজমার কাছে যেতে পারল না। চেষ্টা করবে কালকে সকালে যাওয়ার। অন্তত আজকে রাতটা অপেক্ষা করা দরকার।

সেদিন রাতেও ফাতেমা আন্টি আসল না। দুই দিন হয়ে গেল। কোথাও গেলে তো এতোক্ষনে এসে পড়ত। রাবেয়া পুরোপুরি নিশ্চিত যে ফাতেমা আন্টির কিছুনা কিছু একটা বিপদ অবশ্যই হয়েছে।

আন্টিকে ছাড়া রাবেয়ার চলাফেলাই কষ্টকর। অনেক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে রাবেয়া নাজমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। অত সকালে এই রাস্তায় রিকসা পাওয়া যায় না। কিছুটা পথ রাবেয়ার অগত্যা হেঁটে যেতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

রাবেয়া কাধে করে একটা ব্যাগ। এতো সকালে কাক পর্যন্তও ঘুম থেকে উঠে নি। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের বাতি এখনো জ্বলছে। কিছু লোক অনেক দূরে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছে।

অন্তত রাবেয়ার আশেপাশে কেউ নেই। সে কেবল হেঁটেই যাচ্ছে আনমনে। হঠাৎ রাবেয়া থমকে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে পেছনের দিকে তাকায় রাবেয়া। তার মনে হচ্ছে পেছনে কেউ একজন তাকে অনুসরন করছে। কিন্তু না, পেছনে তো কেউ নেই! তাহলে এমনটা মনে হল কেন রাবেয়ার।
হতেই পারে। মাঝে মাঝে অন্ধকারে একা একা হাঁটলে এরকম সবারই হয়।
রাবেয়া আবার হাঁটা আরাম্ব করল। কিছুদূর যাওয়ার পরে তার ধারণা পুরোপুরি পালটে গেল। আবার মনে হল কিছু একটা তাকে অনুসরন করছে। রাবেয়া আবার হাঁটা থামাল। রাবেয়ার মন বলছে পেছনে কিছু একটা আছে। কিন্তু কোন ধরণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সে আবার আস্তে আস্তে পেছনের দিকে তাঁকাল। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে এইবারো কিছু দেখা গেল না।

রাবেয়া হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল। সে হাঁটছে তো হাঁটছেই। আর থামল না। হঠাৎ করে রাবেয়া পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখতেই সে একটা ভয়ানক চিৎকার দিল। তার ঠিক তিন চার হাত পেছনেই দুজন লোক কালো মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দুজনের হাতে দুইটা লম্বা ছুরি।
চিৎকার দিয়েই রাবেয়া সামনের দিকে ছুটতে লাগল। যত শক্তি দিয়ে পারা যায়। কিন্তু সেই দুটো লোকের সামনে ছুটে পালানো রাবেয়ার পক্ষে অসম্ভব। লোক দুইটা চিতাবাঘের মতো গতিতে রাবেয়ার দিকে ছুটে আসছে। এদিকে রাবেয়া দৌড়ানোর কারনে পেঁটের মধ্যে ঝাঁকি লাগে। আর যার জন্য পেঁটের ভিতর ব্যাথা শুরু হয়ে যায়।

রাবেয়ার পক্ষে এখন আর দৌড়ানো সম্ভব না। তাই সে ধপাস করে রাস্তায় পড়ে যায়। এদিকে পেছনের দিক থেকে সেই লোকদুটো এখনো ছুটে আসছে। আর কয়েক মূহুর্ত পরেই তারা রাবেয়াকে ধরে ফেলবে। রাবেয়ার চোখের সামনে আস্তে আস্তে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যেতে আরাম্ব করল। তারপর রাবেয়ার আর কিছুই মনে নেই।

রাবেয়ার জ্ঞান ফিরে আসলে সে নিজেকে একটা বিছানায় আবিস্কার করল। মাথাটা প্রচুর ব্যাথা করছে। রাবেয়া কিছুক্ষন একটা ঘোড়ের মধ্যে ছিল। ঘোড় কাঁটার পর রাবেয়া বুঝতে পারল তার হাত ও পা বেঁধে রাখা হয়েছে। কিছুক্ষন হাত-পা নাড়াচড়া করার পরেও রাবেয়া দড়িগুলো ছাড়াতে পারল না।
রাবেয়া খেয়াল করেছে তার পেঁটের ব্যাথা এখনো কমে নি। এই মূহুর্তে রাবেয়ার করার কিছু

নেই। তাই রাবেয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করল, আল্লাহ! তুমি আমাকে রক্ষা করো!
রাবেয়া মনে মনে ভাবে, আল্লাহ কি তার দোয়া কবুল করবে? সে তো আল্লাহর হুকুম বেশি মানে না। জীবনে অনেক নামাজ ক্বাজা করেছে। তারপরেও রাবেয়া আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়।

অনেক্ষন সময় পার হয়ে গেল। এখনো আশেপাশে কারো খোঁজখবর পাওয়া যায় নি।

রাবেয়া একবার জোরে ডাক দিল, "এখানে কেউ আছেন?" কিন্তু গলার স্বর বেশি দূরে গেল না। এমনিতেই পেঁটের ব্যাথা, তারমধ্যে আবার ক্ষুধা এসে যোগ হয়েছে। রাবেয়া এখনো বুঝতে পারে নি এখানে কে তাকে ধরে আনল। তাদের উদ্দেশ্যটা কি?
রাবেয়া যেই ঘড়ের মধ্যে আছে সেই ঘড়টা বেশি বড় না। ঘড়ে শুধু একটা মাত্র বিছানা। কিন্তু তার মধ্যেও কোন তোষক নেই। কেবল একটা পাঁটি পাতানো আছে। রাবেয়া খেয়াল করল, ঘড়ে থাকা একটা জানালার দিকে। জানালাটা বন্ধ। তার পাশে থাকা দরজাটার নিচ দিয়েই ঘড়ের ভিতর যা আলো আসছে। ঘড়টার মধ্যে বড্ড গরম লাগছে রাবেয়ার। ইলেক্ট্রিসিটি আছে নাকি তা বলা দায়। বাতির একটা হোল্ডার আছে। কিন্তু তাতে কোন বাল্ব লাগানো নেই।

রাবেয়া আবার একটা ডাক দিতে যাবে ঠিক সেই সময় দরজার মধ্যে এক ধরণের আওয়াজ হল। বুঝতে পারল, কেউ একজন দরজাটা খুলছে। শব্দটা শুনে রাবেয়া সতর্ক হয়ে গেল। সামনে সে একটা বড় বিপদের আভাস পাচ্ছে।
দরজাটা খোলার পর ঘরটা আরো একটু আলোকিত হল। রাবেয়া দেখল, একটা ছেলে ঘড়ের ভিতর ঢুকল। বয়স আনুমানিক, পঁচিশ ছাব্বিশের মতো হবে। গায়ে কালো একটা জ্যাকেট। এতো গরমের মধ্যে ছেলেটা কালো জ্যাকেট পড়ে আছে কেন, সেই কারনটাই রাবেয়ার মাথায় ঢুকছে না।

ছেলেটার মুখের মধ্যে একটা কালো রঙের রুমাল পেচানো। চেহাড়াটা অনুমান করল রাবেয়া। গায়ের রঙ শ্যমলা। চুলগুলো একটু বড়। ছেলেটা রাবেয়ার আরো কাছে এগিয়ে আসল। এখনো আসছে। রাবেয়া ছটফট করতে লাগল।
- প্লিজ আমাকে ছেড়ে দিন।
রাবেয়া কান্না জড়িত কন্ঠে কথাটা বলল। কিন্তু ছেলেটা সেই কথা শুনে কোন ধরনের ভ্রুক্ষেপ করল না। বরং আরো কাছে এসে রাবেয়ার থুতনির মধ্যে হাত দিয়ে ডানে বায়ে ঝাকি দিল। ভয়ে রাবেয়ার চোখ বন্ধ হয়ে আসল।

তখন ছেলেটা বলে উঠল, এখানে সারাদিন চিৎকার করেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং অযথা চিৎকার করে কোন লাভ নেই। এতে শক্তির অপচয়।
রাবেয়া ভয়ে এক্কেবারে চুপসে গেছে। মুখ দিয়ে এমনিতেই আর কথা বের হচ্ছে না। ছেলেটা যাওয়ার আগে রাবেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে গেল, একদম কথা বলবি না।
ছেলেটা আবার দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। ঘড়টা আবার অন্ধকারে তলিয়ে গেল। রাবেয়া নিশ্চুপ।

কতক্ষন যাবৎ রাবেয়া শুয়ে ছিল তার খেয়াল নেই। এখন কয়টা বাজে তাও রাবেয়ার জানা নেই। ক্ষুধার কারণে পেঁটের মধ্যে মোচড়ানো আরাম্ব করেছে। কিন্তু নাড়াচাড়া করার কোন উপায় নেই। একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে শরির ব্যাথা করছে। কিন্তু শয়তান লোকগুলো এসব যেন কিছু বুঝতেই পারছে না।

আরো কিছু সময় পার হয়ে গেল। সেই সময়ের মধ্যে কেউ রাবেয়ার সাথে দেখা করতে আসল না। এমনকি খাবার নিয়েও না।
রাবেয়া যখন বুঝতে পারল রাত হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় রাবেয়ার কাছে একটা লোক আসল। সেই ছেলেটা না। অন্য মধ্যবয়স্ক একটা লোক। মাথার অর্ধেক চুল পড়ে টাক গজিয়েছে। সেই লোকটা খাটের কাছে চলে আসল। রাবেয়া বুঝতে পারছে লোকটা তার দিকে খারাপ নজরে তাকাচ্ছে। বুকের ওড়নাটা অনেকটা এলোমেলো হয়ে আছে। কিন্তু রাবেয়ার সেটা ঠিক করার উপায় নেই। এমন লজ্জার মুখে সে আগে কখনো পড়ে নি। এদিকে লোকটা তাকে এখনো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে যাচ্ছে।
রাবেয়া হালকা গলায় লোকটাকে বলল, প্লিজ! আমাকে যেতে দিন। কেন এখানে আমাকে আটকে রেখেছেন?
লোকটা একটা বিচ্ছিরি ধরনের হাঁসি দিয়ে বলল, কালকের দিন পরেই বুঝতে পারবে সুন্দরী। আজকে রাতটা একটু কষ্ট কর। কালকে সকালের মধ্যেই সব কষ্ট শেষ। খালি সুখ আর সুখ।
লোকটা কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে রাবেয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। তখন রাবেয়া বলল, প্লিজ! আর কাছে আসবেন না।
- কেন? ভয় লাগে? ভয় লাগার কি আছে? আমরা তো তোমার কোন ক্ষতি করব না। বরং উপকার করব।
- আমাকে এখান থেকে যেতে দিন!
- আরে বাদ দাও তো। কখন থেকে খালি বলছ যেতে দিন যেতে দিন। কি করবে গিয়ে? কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? কে আছে তোমার?
রাবেয়া চুপ হয়ে গেল। এই লোকটা এসব কেমন করে জানল?
লোকটা আবার বলতে আরাম্ব করল, এভাবে অনাহারে থাকলে একসময় ভুগতে ভুগতে মরে যাবে। শহরের কেউ তোমার দিকে তাকাবেও না। বুঝেছ?
তারচেয়ে একটা রাস্তা বাতলে দেই। সারাজীবন পায়ের উপর পা তুলে খেতে পারবে। টাকাপয়সার কোন অভাব হবে না।

রাবেয়া প্রথমে বুঝতে না পারলেও এখন ঠিকই বুঝতে পারছে। সেই লোকটা রাবেয়াকে কিসের কাজের কথা বলছে।
কোনমতেই রাবেয়া নিজের ইজ্জত বিক্রি করবে না। এতে যাই হয়ে যাক না কেন।
লোকটাকে রাবেয়া বলল, আজকে সারাদিন কিছুই খাই নি। খাওয়ার কিছু হবে?
- হুহ! এখানে দাওয়াত খাওয়াতে নিয়ে আসি নি। যে তোমার জন্য এখন পোলাও কোরমা রান্না হবে।
- অন্তত পানিটা তো পাওয়া যাবে!

- সেটা পরে ভেবে দেখা যাবে।
লোকটা রাবেয়াকে পুনারায় একা রেখে চলে গেল। যাওয়ার সময় রাবেয়া তাকে পেছন থেকে বলল, অন্ধকারে আমার ভয় লাগে। একটা আলোর ব্যাবস্থা করে দিন না!
লোকটা পেছনের দিকে ফিরে তাকাল ঠিক। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ ঘুড়িয়ে চলে গেল। রাবেয়ার একটা কথারও সে পাত্তা দিল না। ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল।
অন্ধকার যেন রাবেয়াকে এক লহমায় গিলে ফেলল। কিন্তু কিছু করার নেই। বড্ড ভয় করতে লাগল রাবেয়ার। এই পরিমান ক্ষুধা নিয়ে ঘুম আসবে কিনা তাও বলা কঠিন।

কখন রাবেয়ার ঘুম চলে এসেছে সেটা রাবেয়া বুঝতেই পারে নি। ঘুমটা হয়তো বেশিক্ষন ছিল না। রাত বাড়ার সাথে সাথে মশার উপদ্রপ শুরু হল। শরিরটাকে কোনরকম ঝাকি দিয়ে মশা তারাচ্ছে রাবেয়া। কিন্তু এভাবে কতক্ষন। হাত বাঁধার কারনে চুলকাতেও পারছে না। অন্ধকারে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। প্রচন্ড ভয় হচ্ছে রাবেয়ার। এরকম অন্ধকার রাত সে আগে কখনো দেখে নি। ডাকার চেষ্টা করেও আর লাভ হবে না। রাবেয়া জানে, তার ডাকে এখানকার কেউ আসবে না।

রাতটা যে রাবেয়া কেমন করে পার করল তা বলে কাউকে বুঝানো যাবে না। সারারাত ভালোমতম ঘুম হয় নি। মশার কামড়। সকাল হওয়ার পর রাবেয়া যেন একটু সস্তি পেল। বাইরের একটু আলো ঘড়ের ভেতর প্রবেশ করছে। রাবেয়া কেবল দুটি পায়ের পাতা দেখতে পাচ্ছে। পায়ের পাতাদুটো ফুলে লাল হয়ে আছে।

কিছুক্ষন পর রাবেয়ার সামনে আরেকটা লোক এসে উপস্থিত হল। নতুন একটা লোক। মাঝামাঝি বয়স। তার সাথে সাথে আরো একটা লোক আসল। হাতে একটা রুমাল। হয়তো রুমালের মধ্যে ক্লোরোফর্ম মিশানো আছে। নাকে ধরার সাথে সাথে জ্ঞান হাড়াবে রাবেয়া। রাবেয়া বুঝতে পারল সামনে কি হতে চলেছে।
রাবেয়া দ্রুত একটা স্বীদ্ধান্তে পৌছালো। রুমালটি মুখে ছাপিয়ে ধরার আগে লম্বা একটা প্রশ্বাস টেনে নিবে। তারা যখন রুমালটি রাবেয়ার মুখে চেপে ধরবে সেই সময় রাবেয়া নিঃশ্বাস আটকে রাখবে। যাতে ক্লোরোফর্মটা ফুসফুসে না পৌছায়। কোনমতেই যেন নিশ্বাস চালু না হয়। এক পর্যায়ে রাবেয়া ইচ্ছে করেই ঘুমের ভান করবে। তখন সেই লোকগুলোও তার মুখ থেকে রুমালটি সরিয়ে ফেলবে।

কিন্তু সেই পদ্বতিটা কি কাজে আসবে? সেই চিন্তা করতে করতেই একটা লোক রুমাল নিয়ে যখন রাবেয়ার কাছে আসতে লাগল, সেই সময় রাবেয়াও একটা বড় প্রশ্বাস টেনে নিল। লোকটা রাবেয়ার মুখে রুমালটা চেঁপে ধরেছে। রাবেয়া দম আটকে রাখল। নিশ্বাসটা আসতে আস্তে ছাড়তে লাগল রাবেয়া।
রাবেয়া এই সময়টাতে অনেক নার্ভাস। ভয়ের সময় এমনিতেই হার্ট রেট বেড়ে যায়। নিশ্বাস ঘন হয়ে আসে। তাই রাবেয়ার দম আটকে রাখতে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এখন ভুলেও প্রশ্বাস নিলে রাবেয়া অজ্ঞান হয়ে যাবে।

৬ থেকে ৭ সেকেন্ড পর রাবেয়া ইচ্ছে করেই নিজের মাথা এলিয়ে দিল। চোখটা বন্ধ করে ফেলল। সেই লোকগুলো হয়তো ভাবছে এই মূহুর্তে রাবেয়া অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাই লোকটা রাবেয়ার মুখ থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল।
এই ৬-৭ সেকেন্ড সময়টাই রাবেয়ার কাছে কয়েক মিনিটের মত মনে হচ্ছিল। প্রাণ খুলে চোখ বোঁজা অবস্থাতেই আস্তে আস্তে করে একটা প্রশ্বাস নিল। এই যাত্রায় মনে হয় বেঁচে গেল রাবেয়া।

- ঠিকঠাক জ্ঞান হাড়িয়েছে তো!
- হ্যা বস।
রাবেয়া চুপচাপ শুয়ে থেকে তাদের কথা শুনছিল। লোকগুলো রাবেয়াকে কোথায় যেন নিয়ে যাওয়ার কথা বলল। কিন্তু জায়গাটার সম্পর্কে কিছু জানতে পারল না।
একসময় লোকগুলো রাবেয়ার পায়ের বাধন আর হাতের বাধন খুলে ফেলল। তারপরেও রাবেয়া কোনরকম নরাচরা করল না। ধৈর্য ধরে কেবল অপেক্ষা করছে সে।

একটা ছেলে এসে বলল, বস! গাড়ি রেডি।
আরেকটা লোক বলল, এই তোরা এই মেয়েটাকে ধরে নিয়ে আয়।
সেই কথা শুনে হয়তো দুইটা ছেলে রাবেয়াকে উঠালো। রাবেয়া নিস্তেজ হয়ে আছে। একটা ছেলে রাবেয়ার দু পা ধরল। আরেকটা ছেলে দু হাত ধরে নিয়ে যেতে আরাম্ব করল। ছেলেগুলো রাবেয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না।
অনেক্ষন পর ছেলেগুলো একটা গাড়ির মধ্যে আসল। একটা মাইক্রোবাস। রাবেয়াকে একটা সিটের মধ্যে শোয়ানো হল।
গাড়ির দরজা আটকে দেওয়া হল। তখন, একটা লোক একটা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল, এই! তুই এখানেই থাক। আমরা কজন ভেতর থেকে জিনিসপাতি নিয়ে আসছি। খবরদার এখান থেকে নড়বি না। কিছু হয়ে গেলে কিন্তু তোর রক্ষা নেই।
- আপনি কিছু চিন্তা করবেন না বস। আর তাছাড়া মেয়ে তো অজ্ঞান।
- তবুও সাবধান।

লোকগুলো সেই ছেলেটাকে রেখে আবার রুমের ভেতর ঢুকে পড়ল কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনতে। কি আনবে সেটা রাবেয়া জানে না।

রাবেয়া মনে মনে ভাবল এটাই সময়। এইরকম সুযোগ হয়তো আর পরে পাওয়া যাবে না। রাবেয়া হালকা করে চোখের পাতাটা খুলল।

রাবেয়া দেখতে পেল, সেই ছেলেটা এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে রাবেয়ার দিকেও তাকেচ্ছে। গাড়ির বাইরে থেকে হয়তো ভেতরে অত স্পষ্ট দেখা যায় না। জায়গাটা সম্পর্কে রাবেয়ার কোন ধারণা নেই। কোন দিকে কি আছে তাও জানে না। কিন্তু এখন সেটা দেখলে চলবে না।

রাবেয়া আস্তে করে অপর পাশের দরজাটার লক খুলল। ছেলেটা এখনো টের পায় নি। অপর পাশ থেকে দেখার সম্ভাবনা কম। রাবেয়া চিন্তা করেছে দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলে এক মূহুর্তের জন্যও শুয়ে থাকা যাবে না। সাথে সাথে দৌড়াতে হবে। তবে বেশি সুযোগের অপেক্ষায় থাকা যাবে না। হাতে সময় খুব কম। সেই লোকগুলো হয়তো কিচ্ছুক্ষণ পরেই এসে পড়বে। তখন পালাবার আর পথ থাকবে না।

ছেলেটা আরেকটু অমনোযোগী হতেই কাপাকাপা হাত দিয়ে দরজাটা এক ধাক্কায় খুলে ফেলল। সাথে সাথে উঠেই রাবেয়া দিল এক ভো দৌড়। বাইয়ে থাকা ছেলেটা যেন এসব কল্পনাও করতে পারে নি। ছেলেটার- ব্যাপারটা বুঝে উঠার আগেই রাবেয়া অনেক দূরে চলে গেল। একসময় ছেলেটাও চিৎকার করতে করতে রাবেয়াকে ধরার জন্য দৌড় আরাম্ব করল। ছেলেটার চিৎকার শুনে ভেতরে থাকা লোকগুলোও হয়তো বাইরে বের হয়ে আসল। তারাও রাবেয়ার পেছনে হয়তো ছুটতে লাগল।

রাবেয়ার যেন আর হুস নেই। কোন বাঁধাই সে মানবে না। তার পেঁটে যে একটা বাচ্চা, আর দৌড়ালে যে সেই বাচ্চার ক্ষতি হবে, সেই চিন্তাটুকুও আজ রাবেয়ার নেই। সে যে ক্ষুধার্ত, হয়তো সেই খেয়ালটাও রাবেয়ার নেই। প্রাণপনে যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যাচ্ছে।

ছোটবেলায় রাবেয়া অনেক চমৎকার দৌড়াত। দৌড় প্রতিযোগিতায় রাবেয়া ছিল সবার সেরা। শুকনো দেহ। সেই দেহ নিয়ে রকেটের মত ছুটে সবাইকে পেঁছনে ফেলে পুরস্কার নিয়ে আসত।

আজও রাবেয়া দৌড়াচ্ছে। ভয়ে। পেছনে কয়েকটা গুন্ডা। হয়তো কিছুক্ষন পরে ধরেও ফেলবে। কিন্তু যেভাবেই হোক, বাঁচতে তাকে হবেই। পেঁটের ব্যাথাটা এখন ব্যাথাই মনে হচ্ছে না। পেছনের লোকগুলো এখন কোথায় আছে সেটাও রাবেয়া জানে না। পেছনে তাকানোর সময়টাও এখন রাবেয়ার নেই।

- এই শুয়রের বাচ্চা। তোকে না বলে গেলাম মেয়েটাকে চোখে চোখে রাখবি। পালিয়ে গেল কিভাবে?
- তোমরাই তো অজ্ঞান করলে। জেগে উঠল কিভাবে?
- সেটাই তো বুঝতে পারলাম না। এই! অসুধটা ঠিকমতো দিয়েছিলি তুই?
- হ্যা বস, দিয়েছিলাম।
- তাহলে সমস্যাটা কোথায়?
- বস! হয়তো অসুধটা নাকের ভেতরে ঢুকেছিল না।
- অসুধ নাকে না ঢুকলে অজ্ঞান হল কেমন করে?
- কিজানি! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।
- এখন উপায় কি হবে!
- বাবুকে কি জবাব দেব?

- এই তোরা আমাকে একটু ভাবতে দে। সবগুলা আহাম্মক তোরা। সহজে একটা ** পেয়েছিলাম। তোদের জন্য সেটাও হাঁরালাম। আর কবে পাবি?

দৌড়াতে দৌড়াতে রাবেয়া একটা গাড়ির সামনে এসে ধাক্কা খেল। কপালে হালকা একটু ব্যাথা পেল। কিন্তু তারপরেই আর কিছু মনে নেই রাবেয়ার।

কতক্ষন সময় পার হয়েছে রাবেয়া সেটা জানে না। রাবেয়ার যখন জ্ঞান আসল তখন সে নিজেকে আবার একটা বিছানায় আবিস্কার করল। হাসপাতালের বিছানা। হাতে একটা স্যালাইনের সুই ঢুকানো। আচ্ছা! কে এখানে আনল রাবেয়াকে?
কিছুক্ষন পর একটা নার্স আসল রাবেয়াকে দেখার জন্য। রাবেয়া তাকে জিজ্ঞেস করল, আমি এখানে আসলাম কেমন করে?
- আপনি দৌড়াতে দৌড়াতে গাড়ির সামনে চলে এসেছিলেন। একটা ভদ্রলোক আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আর আপনি তো গর্ভবতী। এভাবে রাস্তায় দৌড়াচ্ছিলেন কেন?
রাবেয়া চুপ করে রইল। আসল কথাটি বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। নার্স মেয়েটি আবার বলল, পেটে কি ব্যাথা করছে?
- অনেক ব্যাথা করছে।
- একটা আল্ট্রাসনোগ্রাফি করতে হবে। দোয়া করুন বাচ্চা যেন সুস্থ থাকে।

কিছুক্ষন পর রাবেয়াকে আল্ট্রা করার রুমে নিয়ে গিয়ে একটা আল্ট্রা করানো হল। রিপোর্ট আসতে কিছুক্ষন দেরি হবে। তখনি বোঝা যাবে বাচ্চার কি অবস্থা। রাবেয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করল, আল্লাহ! আমার বাচ্চাটার কোন ক্ষতি তুমি করো না। আমি জানি, তুমি আমার সাথে আছো। তা নাহলে সেই খারাপ লোকদের হাত থেকে আমি কখনোই রক্ষা পেতাম না। আর একটা আরজি তুমি কবুল কর। আমার বাচ্চাটাকে তুমি দুনিয়ার মুখ দেখিও।

অনেক কান্না করল রাবেয়া। কিছুক্ষন পরে একটা ভদ্রলোক রাবেয়ার কপালে হাত রাখল। রাবেয়া প্রথমে একটু চমকে গেল। কিন্তু লোকটার চাহনি দেখে পরক্ষনেই রাবেয়া শান্ত হয়ে গেল। লোকটা রাবেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, এখন কেমন আছ?
রাবেয়া আস্তে করে জবাব দিল, ভালো।
- তুমি দৌড়াতে দৌড়াতে আমার গাড়ির সামনে চলে এসেছিলে। অনেক আঘাত পেয়েছিলে হয়তো। পরে তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে আসি। ডাক্তারের কাছে জানতে পারলাম তুমি প্রেগন্যান্ট। দোয়া করি তোমার বাচ্চাটা যেন ভালো থাকে। আচ্ছা! তুমি তখন ওভাবে দৌড়াচ্ছিলে কেন?
রাবেয়া প্রথমে কিছু বলতে না চাইলেও লোকটার পুনর্বার অনুরোধে সে বলল, কয়েকটা খারাপ লোক আমার পিছু নিয়েছিল।
ভদ্রলোকটা হয়তো আরো কিছু সময় রাবেয়ার পাশে কাঁটানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একটা নার্স এসে লোকটাকে বের হয়ে যেতে বলল। রাবেয়ার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন।

পেঁটের ব্যাথা এখনো কমে নি। রাবেয়া ব্যাথাটা খুব কষ্ট করে সহ্য করছে। রাবেয়ার মনে দুশ্চিন্তার বাসা বাঁধছে। সোনামণিটার কিছু হয়ে যায় নি তো! আচ্ছা! ফাতেমা আন্টির খবর কি? আন্টি কি ফিরে এসেছে? নাজমা হয়তো এর মধ্যে রাবেয়ার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খোঁজ পায় নি। দুজনেই নিখোঁজ।
শুয়ে শুয়ে এসব কথাগুলোই ভাবছিল রাবেয়া। তখনি একজন ডাক্তার ভেতরে প্রবেশ করে। এসেই সে বলল, আপনার কি ভাগ্য! সামান্যর জন্য এই যাত্রায় বেঁচে গেছেন। আপনার শরিরের উপর দিয়ে যেই পরিমান ধকল গেছে। সেই অবস্থায় পেঁটের বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি তো কামাল করে দিয়েছেন। এখনো আপনার বাচ্চা পুরোপুরি সুস্থ। তবে একটু ঝাকুনির কারনে পেশিতে টান পরেছে। যায় কারণে হালকা ব্যাথা হতে পারে। তবে সাবধান! এই যাত্রায় বেঁচে গেছেন বলে যে সব সময় বেঁচে যাবেন তার কোন গ্যারান্টি নেই। তাই সাবধান। কিছুদিন সম্পুর্ন বিশ্রামে থাকতে হবে।

পরদিন সকাল বেলা রাবেয়ার হাসপাতাল থেকে ছুটি হল। সেই লোকটা রাবেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। লোকটা রাবেয়াকে দেখে বলল, এখন কেমন লাগছে?
- ভালো লাগছে। আপনাকে ধন্যবাদ।
- কি বলছ তুমি! আমার জন্যই তুমি অ্যাকসিডেন্ট করলে। আর আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না? অফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু কোনভাবেই মন বসছিল না। চিন্তায় ছিলাম, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে কি উপায় হত? সেইজন্য আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছি।
- ভালোই হয়েছে। সেদিন আপনার গাড়ির সামনে না আসলে সেই বদমায়েশ লোকগুলো আমাকে ধরে ফেলত। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন।
- ধন্যবাদ।
- আচ্ছা! আরো একটা উপকার করতে পারবেন আমাকে?
- কি?
- আপনার গাড়ি দিয়ে আমাকে আমার বাসায় নিয়ে যাবেন?
- সে আর এমন কি? চল তাহলে। আচ্ছা! তোমার নামটা কি জানতে পারি?
- জ্বি! রাবেয়া।
রাবেয়ার হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে। লোকটা রাবেয়াকে ধরতে চাইলে রাবেয়া ধন্যবাদ দিয়ে বলল, আমি পারব।

দুদিন পর রাবেয়া নিজের বাসায় আসল। বাসার অবস্থা খারাপ হয়ে আছে। দুদিনে মাকড়সার জালে ঘড় পুরো ভরে গেছে। কিন্তু এটা ভেবে রাবেয়া কষ্ট পেল যে, ফাতেমা আন্টির দেখা সে এখনো পায় নি। রাবেয়া চিন্তা করেছিল ফাতেমা আন্টি হয়তো এই দুদিনে ফিরে এসেছে। কিন্তু এখনো সে আসে নি।
সেই লোকটা রাবেয়ার পিছনে পিছনে এসেছে। লোকটা বলল, তুমি এই বাসার মধ্যে একাই থাকো?
লোকটার কথা শুনে রাবেয়া মন খারাপ করে জবাব দিল, আমার সাথে আরো একজন থাকত। তাকে আন্টি বলে ডাকতাম। চারদিন ধরে তাকে খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেছে, কি

হয়েছে কিছুই জানি না আমি!
- পুলিশকে জানিয়েছিলে?
- জানিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে আন্টির সম্পর্কে অতটা তথ্য নেই। তার একটা ছবিও নেই আমার কাছে। তারা বলেছে, এই কম তথ্যের ভিত্তিতে আপনার আন্টির খোঁজ পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

কার যেন একটা আসার শব্দ পেল রাবেয়া। রাবেয়া পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল আমিরুল চাচা। তাকে দেখেই রাবেয়া উত্তেজিত হয়ে গেল। রাবেয়া তাকে বলল, চাচা! আন্টির কোন খোঁজ পেয়েছ?
আমিরুল চাচার মন খারাপ। মাথা নিচের দিকে। রাবেয়া আবার বলল, কি হলো? আন্টির খবর জানো?
- হ্যা।
রাবেয়া খুশি হতে গিয়েও থেমে গেল। চাচার মন খারাপ করা দেখে সে বলল, কি হয়েছে তোমার? মন খারাপ কেন? ফাতেমা আন্টি কোথায়? কি হয়েছে তার?
আমিরুল চাচা যেন পাথর হয়ে আছে। দুরে দাঁড়িয়ে সেই লোকটা কেবল এসব দেখে যাচ্ছিল। রাবেয়া আমিরুল চাচার হাতের মধ্যে ঝাকি দিয়ে বলল, বলছনা কেন, আন্টি কোথায়?
- তোর আন্টি আর ফিরে আসবে না। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।
রাবেয়া কিছুক্ষনের জন্য যেন পাথর হয়ে গেল।
- কিভাবে?
- কালকে সকালে পুলিশ এসেছিল। তারা বলল, নদীতে একটা লাশ পাওয়া গেছে। একটা মহিলার। কালো রঙের শাড়ি। তোকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু অনেক খোঁজার পরেও তোকে পেলাম না। উপায় না পেয়ে তাদের সাথে আমিই গেলাম। নদির পাড়ে গিয়ে দেখি....
কান্না করে দিল আমিরুল চাচা।
রাবেয়াও ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেলেছে। সেই লাশটা ফাতেমা আন্টিরই ছিল। তিন দিন আগের মৃতদেহ। শরির থেকে পঁচা এক ধরণের গন্ধ বের হচ্ছিল। শরির ফুলে সাদা হয়ে গিয়েছিল।
দুজন অনেকক্ষন চুপচাপ। অচেনা লোকটার মুখেও হতাসার ছাপ।

....

- আন্টি এমন কেন করল?
- আমাদের কাউকে তো বলেনি।
- আন্টির মনটা অনেকদিন ধরে খারাপ ছিল। অনেকবার বলেছি আমাকে তোমার সমস্যার কথা খুলে বল। কিন্তু বলেনি। সারাক্ষন মন খারাপ করে কাজ করত। কথাই বলত না বেশি আমার সাথে।
তা লাশের কি করা হয়েছে?

- কি আর হবে। বেওয়ারিশ লাশ হিসাবে দাফন করে দিয়েছে। সবাই মেনে নিয়েছে এটা একটা আত্নহত্যা।

রাবেয়ার চোখে এখনো পানি। এখন কে তার যত্ন করবে? আন্টি ছাড়া তার পাশে তো আর কেউ ছিল না। এখন কে টাকা রোজগার করে রাবেয়াকে সাহায্য করবে? খুব একা একা লাগছে রাবেয়ার।

মাথার মধ্যে রাবেয়া একটা হাতের স্পর্শ পেল। রাবেয়া তাকিয়ে দেখল সেই লোকটা তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। রাবেয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, তোমার কষ্টটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কি বলে যে তোমাকে শান্তনা দেব, সেই ভাষা আমার জানা নেই। আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আপন কেউ নেই। চিন্তা করো না। আল্লাহ সব ভালো করে দিবে।
তোমাকে একটা কথা বলি! রাজি হবে?
রাবেয়া মাথা উপর নিচ করে হ্যা বোধক জবাব দিল।
- বলি কি! এখানে তো তোমার কেউ নেই। তারচেয়ে তুমি বরং আমাদের বাসায় কিছুদিনের জন্য চলে আস।
রাবেয়া লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকাল। পরক্ষনেই আবার আমিরুল চাচার দিকে তাকাল। কি বলবে সেই ভাষাটাই যেন রাবেয়া হাড়িয়ে ফেলেছে।
- এই বাড়ি ছেড়ে আমি কিভাবে যাব?
- চিন্তা করো না। আমার বাসায় আমার স্ত্রী আছে। তার সাথে ভালো সময় কাঁটাতে পারবে।
- যেই আন্টি আমার দেখাশুনা করত, সেই আন্টি মারা যেছে। আর আপনি সময় কাঁটানোর কথা বলছেন?

কিছুক্ষন চুপ থাকল রাবেয়া। তারপর আবার বলতে আরাম্ব করল, এই মানুষটা আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। আমার জন্য জীবন দিয়ে দিতো। তার সৃতি রেখে এখান থেকে আমি কিভাবে যেতে পারি?
একপাশ থেকে আমিরুল চাচা বলে উঠল, যেই মানুষটার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই। সেই মানুষটাকে মিছে মিছে মনে করে কি লাভ? এই ভাইসাহেব ঠিক কথাই বলেছে। তুই কিছুদিন তার বাসায় থেকে আয়। তাছাড়া তোরও তো নিজের একটা জীবন আছে! নাকি? আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। নিজের খেয়ালই ঠিকমত রাখতে পারি না। তোর খোঁজখবর আর কিভাবে রাখব।
রাবেয়া চুপ করে রইল।
লোকটা বলল, আমি জানি তোমার যেতে ইচ্ছা হবে না। অচেনা লোকের বাড়িতে কারই বা যেতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, এখানে তোমাকে দেখাশোনা করার কেউ নাই। তোমার নিজের তো এখন নিজেকে যত্ন নিতে হবে।
আমিরুল চাচা পুনারায় বলল, আর না বলিস না। তুই চলে যা। এখানে তোর অনেক কষ্ট হবে।

অনেক বলার পর অবশেষে রাবেয়া রাজি হল। ব্যাগপত্র সব গুছিয়ে নিল। কাঁধের ব্যাগটা রাবেয়া আর খুঁজে পায় নি। সেই মাস্তান লোকেরা ব্যাগের কি করেছে কে জানে।

সব গুছিয়ে নেওয়ার পর রাবেয়া আমিরুল চাচাকে বলল, চাচা! ভালো থেকো। আর নিজের খেয়াল রাখবে।
- আমি পারব। তুই নিজের খেয়াল রাখিস।
- আমি যাই তাহলে!
- হ্যা।.... আর একটা কথা শুনে যা। তোর বাচ্চা হলে সেই বাচ্চার মুখটা অন্তত আমাকে দেখাস।

মন খারাপ থাকা সত্যেও রাবেয়া আমিরুল চাচার কথা শুনে একটু সময়ের জন্য হেঁসে ফেলেছিল।

লোকটার গাড়ি চলছে আপন গতিতে। রাবেয়া পেছনে বসে আছে। জিনিসপত্র বলতে দুইটা ব্যাগ। তারমধ্যে কাপড়চোপড়, আর টুকটাক জিনিস।
লোকটা রাবেয়াকে বলল, তুমি হয়তো এখনো আমার নামটাই জানো না।
রাবেয়া কোন উত্তর দিল না। লোকটাই একটু পরে বলল, আমার নাম রফিকুল ইসলাম। আমাকে রফিক আঙ্কেল বলে ডাকতে পার।
- ঠিক আছে।
- তা তোমার বাবা-মা কোথায় থাকে?
রাবেয়া কিছুক্ষন দেরি করে জবাব দিল, কবরে।
- ও! আই অ্যাম সরি।
- ওকে।
- তা লেখাপড়া কতদুর করেছ?
- নবম শ্রেণি পর্যন্ত।
- ভালো। তা এখানে চলে আসলে কেন?
- গ্রামে আপন কেউ নেই। একটা বড় বোন আছে বিয়ে হয়ে গেছে।
- তোমার স্বামীর বাড়ির কথা বলছি। সেখান থেকে চলে আসলে কেন?
- শ্বাশুরি আম্মা বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে।
- সো স্যাড। কেন?
- আমাকে পছন্দ করত না। আমার স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই সংসারে আমি একটা বোঁঝা হয়ে গেলাম। তাই কিছু না ভেবে বোনের বাড়ি চলে এসেছিলাম। সেখানেও বেশিদিন থাকতে পারি নি। তাই শহরে চলে আসি।

গাড়ির মধ্যে অনেক কথাবার্তা হল। কথা বলতে বলতেই গাড়ি একটা বড় বাসার ভিতর ঢুকে পড়ল।
- আপনাদের বাড়িটা এতো বড়?
- আমাদের বাড়ি বলছ কেন? আজকে থেকে এইটা তোমারও বাড়ি।

এতো খুশি রাবেয়া হয়তো আগে কখনো হয় নি। গাড়ি থেকে নামতেই একটা লোক গাড়ির

দিকে এগিয়ে আসল। কোন কথা সে বলল না। রাবেয়া বের হতেই লোকটা তাকে বলল, তোমার শরির ভালো তো! তোমার নাকি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?
- হুম। তা আপনি জানলেন কিভাবে?
- কিজে কও আফামনি। রফিক সাহেবই তো আমাকে তোমার সব কথা বলেছে। তোমার অ্যাকসিডেন্ট হওয়াতে যে তিনি কি চিন্তায় ছিলেন। ভাগ্য ভালো তোমার কিছু হয় নি।
রফিক সাহেব লোকটাকে বললেন, এইযে! এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি কথাই বলবেন, নাকি ওকে ওর ঘড় দেখিয়ে দেবেন। এক কাজ করুন, পেছনে ওর ব্যাগ আছে। সেগুলো নিয়ে একটু ওর ঘড়ে রেখে আসুন।
লোকটা বলল, চল আফামনি।
রাবেয়া সেই লোকটার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। ঘড়টা রাবেয়া ভালোমতন দেখতে লাগল। কি সুন্দর একটা ঘড়। দেয়ালে সাদা চুনকাম। বারান্দার ভেতরেরটা আরো অনেক সুন্দর। কিছু কিছু জায়গায় বিশাল বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিং। দুটো থ্রিডি পেইন্টিং দেখে রাবেয়া অবাক হল। একটাতে একটা টিয়া পাখির ছবি। রাবেয়া যেদিকেই যায় পাখিটি মনে হয় তার দিকেই ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকে দেখছে। আরেকটার মধ্যে একটা সুর্যাস্তের ছবি। মনে হয় যেন ছবির ভেতরে ঢুকে পরা যাবে।
কিন্তু রাবেয়া একটা জিনিস খেয়াল করল এই বাড়িটার মধ্যে জনমানব খুব কম। খুব কম বললে ভুল হবে। নেই বললেই চলে। এপর্যন্ত রাবেয়া শুধু সেই দুজন লোককেই দেখেছে। আর কাউকেই দেখে নি।
তাহলে এতো বড় বাড়ি, পেইন্টিং, জিনিসপত্র, এসব কার জন্য?
সামনের লোকটা অনেক দুরে চলে গেছে। রাবেয়া হাঁটার গতি বাড়াল।

"এইযে... এটা আপনার রুম", বলল লোকটি। রাবেয়া চারদিকে তাকাল। কি সুন্দর..। রাবেয়ার মনে হচ্ছে কিছুক্ষনের জন্য সে বেহেশতে চলে এসেছে। এখনি আবার তার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। ঘুম ভেঙ্গে সে দেখবে আবার আগের সেই ভাড়া নেওয়া পুরনো ঘড়।
হাতে একটা চিমটি কাঁটল রাবেয়া। ব্যাথা তো হচ্ছে। তারমানে আসলেই কি এগুলা সব বাস্তব? আজকে থেকে সে এই ঘড়েই থাকবে?
রাবেয়া খুশি হয়ে লোকটাকে বলল, এটা আমার ঘড়?
- হ্যা আফামনি। এইটা তোমার ঘড়।

বড় একটা রুম। ভেতরে অনেক জিনিসপত্র। দুইটা কাঁচের স্যাকেজ। তার ভেতরে অনেকগুলো খেলনা। রাবেয়া সবকিছু ঘুড়ে ঘুড়ে দেখছিল। লোকটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিনিস দেখে রাবেয়া যেন একটু বেশিই অবাক হয়ে গেল, নরম তুলতুলে বিছানা। সেই বিছানার উপরে একটা বড় উলের টেডিবিয়ার।

রাবেয়া সেই লোকটাকে বলল, আচ্ছা! স্যাকেজের মধ্যে এতোগুলা খেলনা, বিছানায় পুতুল, এই ঘড়ে কোন বাচ্চা থাকে নাকি?
লোকটা বলল, থাকত! এখন নেই।

- কেন?
- মরে গেছে।
- কে সে?
- রফিক সাহেবের একমাত্র মেয়ে।

রাবেয়ার কপালে ভাঁজ দেখা গেল। লোকটা তখন বলল, আচ্ছা! আমি আসি তাহলে। কোন সমস্যা হলে আমাকে বলবে। আর আমাকে ইদ্রিস ভাই বলে ডাকতে পার।

শরিরটা অনেক খারাপ লাগছে। হাতমুখ ধুয়ে একটু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে নিতে পারলে ভালো হত। রাবেয়া হাতমুখ ধোয়ার জন্য রুমের এটাষ্ট বাথরুমে গেল। বাথরুমে গিয়েও সে আরো অবাক হল। চকচকে বাথরুম। একটা ছোট বাথটাবও আছে। কিন্তু সেটাতে রাবেয়ার কুলোবে না।

হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় ঘুমাতে গেল। আহ! কি তুলতুলে বিছানা। কেউ শুলে সাথে সাথেই ঘুম এসে যাবে। রাবেয়ারও এসে যেত। কিন্তু পরক্ষনেই ফাতেমা আন্টির কথা মনে পড়ে গেল। আন্টি কেন এরকমটা করল? মনের মধ্যে কিসের এতো কষ্ট? অন্তত রাবেয়ার জন্য তো বেঁচে থাকতে পারত!

কিসের এতো কষ্ট ছিলো তার? রাবেয়ারও তো দুইকুলে কেউ ছিল না। কই! তারপরেও তো সে ভেঙ্গে পড়ে নি। এসব ভাবতে ভাবতে কখন রাবেয়া ঘুমিয়ে পড়ল তারই খেয়াল নেই।

ঘুম ভাংল সন্ধ্যার সময়। ঘড়ের লাইট অফ করা ছিল। রাবেয়া সব সুইচগুলো টিপে টিপে লাইট জ্বালাল। অতটাও গরম না। ফ্যানের দরকার হবে না। লাইট জ্বালানোর পরে রাবেয়া দেখতে পারল ঘড়ের চারদিকটা অনেক আলোকিত হয়ে গেছে। দেওয়ালের রঙ সাদা হওয়ায় সম্পুর্ণ আলো প্রতিফলিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন সব বার্ণিশ করা আসবাবপত্র ঝিকিমিকি করে। রাবেয়া একটু ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমে গেল। বাথরুম থেকে এসে একটু সময়ের জন্য পশ্চিম সাইটের বারান্দায় গেল। বারান্দাটা হয়তো সুর্যাস্ত দেখার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।
হালকা বাতাস গায়ে লাগছে। সুর্যে ডুবে যাওয়া দিকটার রঙ টকটকে লাল হয়ে আছে। যেন সেদিকে ভয়ানক একটা অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। দূর আকাশে কয়েকটা পাখি হয়তো বাসায় ফিরছে।

এইসব ঘটনাগুলো রাবেয়া সর্বশেষ কবে দেখেছিল তার ইয়াত্তা নেই। হয়তো আজকেই প্রথম দেখছে। নয়তো গ্রামে থাকার সময় মাঝে মাঝে দেখেছে। গ্রামেও এতোটা সুন্দর দেখা যায় না হয়তো। আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। দুড়ে হয়তো কোন হোটেলে সিঙ্গারা ভাঁজা হচ্ছে। সেই গন্ধটা এখান থেকে নাকে আসছে। ভালোই লাগছে। গন্ধ নিলে তো আর পেঁট ভড়ে না। যত ইচ্ছা নেওয়া যায়।

রাবেয়া এতোক্ষন মুগ্ধ হয়ে বিষয়গুলি দেখছিল। তার মুগ্ধতার সমাপ্তি হল ইদ্রিস ভাইয়ের ডাক শুনে। পেছন থেকে তিনি ডাকছেন।

ইদ্রিস ভাই বললেন, খাবে না?
- খাবো।
- তাইলে চল। আজকে তোমার জন্য ভালো ভালো রান্না করছে।
- চলুন তাহলে।

রাবেয়া ইদ্রিস ভাইয়ের সাথে গেল। বিশাল বড় ডাইনিং টেবিল। অনেকগুলো চেয়ার পাতানো। ইদ্রিস ভাই বলল, বসো এখানে।
তিনি আরেকটা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই! হা করে কি দেখছিস? আফার জন্য খাবার নিয়ায়!
মহিলাটা খাবার আনতে চলে গেল। এই বিশাল ঘড়ের মধ্যে মাত্র দুইজন লোক। রাবেয়া আর ইদ্রিস ভাই। রাবেয়া একবার তাকে বলল, আচ্ছা! বাকি লোকগুলো কোথায়?
ইদ্রিস ভাই কিছুক্ষন অপেক্ষা করে বলল, আছে। সে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না।
- আচ্ছা! রফিক আংকেলের স্ত্রী কোথায়?
- আস্তে আস্তে সবাই পরিচিত হবে।

মহিলাটি খাবার নিয়ে চলে এসেছে। ইদ্রিস ভাই বললেন, আর কথা না বাড়িয়ে খাও। সারাদিন হয়তো কিছু খাও নি। রাবেয়াও আর কথা বাড়াল না। চুপচাপ খেয়ে নিচ্ছে। ইদ্রিস ভাই বললেন, "আমি যাই তাহলে, সকালে দেখা হবে।" আর মহিলাটিকে বললেন, বোনের খেয়াল রাখিস।

অনেক রাত হয়ে গেছে। রাবেয়া নিজের ঘড়ে চলে গেল। এইবারো কারো সাথে তার দেখা হল না। রাবেয়া একটা চিন্তা তার মাথা থেকে সরাতে পারল না, এতো বড় বাড়িতে লোকজন কোথায়?
আগের সেই বড় বাবুর বাসায় কতো লোকজন ছিল। কিন্তু এই বাড়ির চিত্র সম্পুর্ন উলটা। দুপুরের পর থেকে রফির আংকেলেরও দেখা নেই। তিনিও বা কোথায় থাকেন?

রাবেয়া খেয়াল করেছে, ঘড়ে একটা মশাও নেই। যার কারণে মশারীর দরকার হবে না। খাটের পাশে একটা পড়ার টেবিল।

টেবিলটাতে বাচ্চাদের কিছু বই। রাবেয়া সেগুলো ভালোমতন দেখল। তৃতীয় শ্রেণীর বই। হয়তো এগুলো রফিক সাহেবের মেয়ের। ক্লাস থ্রীতে থাকা অবস্থায় মারা গেছে। রাবেয়া মেয়েটার একটা খাতা বের করল। হাতের লেখা অনেক ফুটফুটে বড় বড়। কয়েকটা লেখা সে পড়ল। পৃষ্ঠা উল্টাতে উল্টাতে রাবেয়া একটা পৃষ্টায় একটা কবিতা দেখতে পেল। কবিতাটা পড়তে লাগল সে,

""জীবনে যাহা চাও তাই তুমি পাবে,
দাঁতে দাঁত চেঁপে সব সয়ে যেতে হবে।
ভালো আর মন্দটা চিনে নিতে হবে,
সেই থেকে জ্ঞান নিয়ে লড়ে যেতে হবে।""
- রাবেয়া

কবিতাটা পড়ে রাবেয়া কিছুক্ষন চুপ করে রইল। শব্দগুলো কেমন জানি তার মনের মধ্যে পাথরের মত আঘাত করল। কিন্তু কেন?
আর তাছাড়া কবিতার নিতে "রাবেয়া" লেখা কেন? তারমানে কি রফিক সাহেবের মেয়ের নামটাও রাবেয়া? রাবেয়াকে কি সে এখন নিজের মেয়ের মত মনে করছে? রাবেয়ার নামটা শুনে হয়তো তার মৃত মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে। যার কারনে রফিক সাহেব একটু বেশিই যত্ন করছে রাবেয়ার।
রাবেয়া খাতাটা বন্ধ করে রেখে দিল। একটু আগের ঘুমেও তার ঘুম ঘুম ভাব কমে নি। সেদিন অতোটা দৌড়ানোর কারনে পায়ে এখনো ব্যাথা করছে।

বিছানায় একটু সময়ের জন্য শুতে গেল রাবেয়া। জীবনের প্রথম সে আজ এরকম বিছানায় ঘুমাচ্ছে। কিন্তু শুয়ে থাকতে গিয়ে রাবেয়া একসময় ঘুমিয়ে গেল।

রাত এগারোটার মতো বাঁজে। রাবেয়া নিজের কপালে একটা হাতের ছোয়া পেল। সাথে সাথে ঘুম ভেঙে গেল তার। মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে দেখল, সামনে রফিক আংকেল বসে আছে। রাবেয়া চোখটা ভালোভাবে কঁচলে নিয়ে উঠে বসল।
রফিক আংকেল বলল, সারাদিন অনেক ব্যাস্ত ছিলাম। তাই দেখা করতে পারি নি। তোমার অসুধটাও আনা হয়েছিলো না। তাই অফিস থেকে আসার পথে ভাবলাম তোমার অসুধগুলা নিয়ে যাই। নাও! অসুধগুলা খেয়ে নাও।

রাবেয়া অসুধ আর গ্লাসটা হাতে নিয়ে অসুধগুলো খেয়ে নিল। রাবেয়ার চোখে একরাশ ঘুম। সেই ঘুমমাখা চোখেই রাবেয়া রফিক আংকেলকে বলল। আপনি না বলেছিলেন, আপনি আমাকে আপনার স্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। রফিক আংকের বলল, সকালে দিলে কেমন হয়?
- তিনি কি ঘুমিয়ে গেছেন?
- না। অত সহজে তিনি ঘুমান না। মাঝে মাঝে সারা রাত জেগে থাকে।
- তাহলে ডেকে দিন না তাকে!
- ডাকলেও যে তিনি আসবেন না।
- কেন? আমার উপর বিরক্ত?
- না। বরং খুশি।
- তাহলে আসতে কি সমস্যা?
- সকালেই বুঝবে।

- আচ্ছা! আরেকটা কথা খুব জানতে ইচ্ছা করছে!
- কি?
- আপনার মেয়ের নামটাও ছিল রাবেয়া। তাই না?
রফিক সাহেব শুধু মাথা নড়াল। কিন্তু মুখ দিয়ে কিছু বলল না।
তিনি গ্লাসটা রাবেয়ার হাত থেকে নিয়ে চলে গেল। রাবেয়া কিছুক্ষন রফিক আংকেলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাবেয়া ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটু বারান্দায় গেল। এখন চারদিকে নিস্তব্ধ। আশেপাশে আওয়াজ নেই। সিঙ্গারার বাসনাটা এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

রাবেয়া ওয়াশরুম থেকে এসে লাইট বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছোটবেলায় রাবেয়া লাইট অফ করে ঘুমাতে ভয় পেত। কিন্তু ইদানিং অভ্যাসটা উলটে গেছে। এখন ঘুমানোর সময় লাইট জ্বলা থাকলে বিরক্ত লাগে।

সকালে রাবেয়ার ঘুম ভাঙ্গল। পুর্ব দিকের জানালা দিয়ে অনেক সুন্দর সুর্য দেখা যায়। সেই সুর্যের আলোতে ঘরটা হলুদ হয়ে গেছে।
রাবেয়া বিছানা থেকে উঠে জানালার পাশে গেল। তাকিয়ে দেখল, সুর্যটা একটা গোলাকার হলুদ বলের মতো দেখাচ্ছে।

আজকে শুক্রবার।
রফিক আংকেল অফিসে যাবেনা হয়তো। সারাদিন বাসাতেই পাওয়া যাবে। উনার স্ত্রীর সাথে দেখা করা দরকার।
রাবেয়া ফ্রেশ হয়ে বাইরে আসল। রাবেয়া দেখতে পেল ইদ্রিস ভাই বাগানের ফুল গাছে পানি দিচ্ছে।
- কেমন আছ আপামনি?
রাবেয়া জবাবে বলল, ভালো।
- রাতে ঘুম হয়েছে ঠিকমত?
- খুব ভালো হয়েছে?
- ভালো হবেনা মানে? এই বাসার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর রুমটা দেওয়া হয়েছে তোমাকে। যেখানে সুর্যদয় ও সুর্যাস্তর দৃশ্য দেখা যায়। রফিক সাহেবের মেয়ের ইচ্ছামত এই ঘড়ের ডিজাইন করা হয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েটাকে নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসত। কখনো কোন আবদার অপুর্ণ রাখতো না। অনেক ভালো ছিল মেয়েটা। একবার আমার জ্বর এসেছিল। চার দিন কাজে যেতে পারি নি। সকালে আমার বাড়ির বিছানায় শুয়ে ছিলাম। বাইরে খেয়াল করি, কে যেন আমার বউয়ের সাথে কথা বলছে। পরে জানতে পারলাম রফিক সাহেবের মেয়েটা আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। আমি বলেছিলাম,"তুমি এতো বড় লোকের মেয়ে হয়ে একটা চাকরের সাথে দেখা করতে এসেছো?"
মেয়েটা কি বলেছিলো জানো? সে বলেছিল," তোমাকে অনেক ভাল্লাগে ভাইয়া"। সেদিন ও

আমাকে ভাই বলেছিলো। তার জন্য আমি ওর ভাই হয়ে গেলাম।

রাবেয়া নিস্তব্ধ হয়ে ইদ্রিস ভাইয়ের কথা শুনছিল। তখন সে ইদ্রিস ভাইকে প্রশ্ন করল, কিন্তু এসব হল কেমন করে?
- তুমি কিসের কথা বলছ?
- ইয়ে মানে! মেয়েটা মারা গেল কেমন করে?
- মেয়েটা মারা যায় নি আপামনি। ও মারা যায় নি।
- কোথায় তাহলে?
- ও সবার মনের মধ্যে এখনো বেঁচে আছে। এখনো মনে হয় ও আমাকে অসুস্থ হলে দেখতে আসে।

ইদ্রিস ভাই একসময় কান্না আটকাতে পারল না। কান্না করতে করতেই বললেন, নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতাম, জানো। আমার কোন মেয়ে নেই। একটা মেয়ের আশা করেছিলাম। কিন্তু পাই নি। মেয়েটা এসে যেন সেই অভাবটা পুরণ করে দিয়েছিলো।
কিন্তু.... কিন্তু! সেই ভাগ্য আমার আর হল না। মেয়েটা আমাদের ছেড়ে চলে গেল। সুন্দর হাঁসিখুশি এই পরিবারটা একসময় হয়ে গেল শুনসান। এখন আর কাউকেই হাঁসতে দেখা যায় না।
মেয়েটা ক্লাস থ্রীতে পড়ত। অনেকগুলা বান্ধবি ছিল। সবাই মিলে যখন এই বাড়িটায় আসত না! বাড়িটা যেন প্রাণ ফিরে পেত।
একবার মেয়েটার জন্মদিনের দিন সবার প্রথমে কাকে কেক খিলিয়ে দিয়েছিল, জানো?
আমাকে।
আমি কিছুক্ষন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোন সপ্নে দেখছি। কিন্তু না। সেটা কোন সপ্ন ছিল না।
সেদিন থেকে নিজেকে কখনো চাকর মনে করিনি। সেদিন সবার সামনে নিজের মুল্যটা অনেক মানে অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

রফিক সাহেব নিজের গাড়িতে করে মেয়েটাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় একদিন ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। দুজনেরই অনেক ক্ষতি হয়েছিল। রফিক সাহেব সে যাত্রায় বাচতে পারলেও নিজের মেয়েটাকে সে বাঁচাতে পারে নি। মেয়েটার মাথায় অনেক আঘাত লেগেছিল।
সেদিন বাসার সবাই যেন পাগল হয়ে গিয়েছিল। রফিক সাহেবকে প্রথমে সংবাদটা দেওয়া হয়েছিলো না। তিনি যখন জানতে পারলেন, নিজের মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই। নিজে যেন পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। কিছুদিন তো এই কথা তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না।

রাবেয়া চুপ করে ইদ্রিস ভাইয়ের কথাগুলো শুনছিল। তার চোখ ভেঁজা। রাবেয়া তাকে শান্ত করার জন্য বলল, যেটা হয়ে গেছে, সেটা তো আর ফিরে আসবে না। মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন।

সেদিন রফিক সাহেবের সাথে দেখা হল। রফিক সাহেবের কাছে রাবেয়া বলল, প্লিজ.. আপনার স্ত্রীর সাথে একটু পরিচয় করিয়ে দিন। একা একা আর ভালো লাগে না।
রফিক আংকেল রাবেয়াকে নিয়ে যেতে লাগল। দোতালার পাশের একটা রুমের মধ্যেই রফিক আংকেলের স্ত্রী থাকে। পশ্চিমদিকে একটা জানালা আছে। রফিক সাহেব তাকে রুমের ভেতরে নিয়ে গেলেন। আন্টি জানালার পাশে একটা রকিং চেয়ারে বসে আছে। রাবেয়া তাকে সালাম দিল। কিন্তু ওপাশ থেকে তার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আন্টি কি সত্যিই রাগ করেছে। করতেই পারে, তার স্বামী অচেনা একটা মেয়েকে নিজের ঘড়ে আশ্রয় দিয়েছে। আন্টির হয়তো এটা সহ্য হয় নি।

রফিক আংকেল বলল, যাও! গিয়ে কথা বলো।
রাবেয়া আস্তে আস্তে আন্টির সামনে গেল। সে ভয় পাচ্ছে। আন্টি এখনো এক মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। রাবেয়া তার এক্কেবারে সামনে গেল। তার চোখের মণি স্থির। রফিক আংকেল এখনও পেছনে দাঁড়িয়ে আছে।
রাবেয়া তার আন্টিকে বলল, কেমন আছেন আন্টি?
চোখের মনিটা একটু সময়ের জন্য যেন কেঁপে উঠল। শরিরের আর কোন কিছু নড়ল না। তার চোখদুটো দেখে রাবেয়ার কেমন যেন লাগল। মনে হচ্ছে সেই চোখের মধ্যেই হাজার হাজার কথা লুকিয়ে আছে। কিন্তু মুখে না বলে, চোখে কথা লুকিয়ে থাকবে কেন?

রাবেয়া রফিক আংকেলকে বলল, কি হয়েছে আন্টির? উনি কথা বলছেন না কেন?
রফিক আংকেল কিছুক্ষন চুপ করে থেকে বললেন, ২ বছর আগে স্ট্রোক করেছিল। সেই থেকে পুরো শরির প্যারালাইজড হয়ে গেছে।
কথাটা শুনে রাবেয়া আবার আন্টির দিকে একনজর তাকাল। তিনি এখনো স্থিতভাবে বাইরে তাকিয়ে আছে। পেছনের দুজনের কথা হয়তো তিনি শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছেন না।
রফিক আংকেল রাবেয়াকে বললেন, কিছুবছর ধরে বিপদ আমাদের পিছু ছাড়ছে না। জানোই তো! দুই বছর আগে আমার মেয়েটা মারা গেছে। মেয়ের নামটাও আমি রাবেয়া রেখেছিলাম। কিন্তু আমার জন্য মেয়েটার মরতে হল।
- তেমন কথা বলবেন না। জীবন মরন সব আল্লাহর হাতে।
- জানো! মেয়েটা যখন ক্লাস থ্রীতে পড়ত, তখন ও স্কুলে যেতে চাইত না। স্কুল নাকি ওর অনেক খারাপ লাগে। স্কুলের সময় হলেই শুধু পেঁটে ব্যাথার ছুতো দিত। সেদিনও মেয়েটা পেঁটে ব্যাথার ছুতো দিয়ে স্কুলে যেতে চাইছিল না। কিন্তু আমি বিরক্ত হয়ে মেয়েকে একটা থাপ্পর দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এভাবে দিনের পর দিন স্কুল কামাই করে কি পাস শুনি? মেয়ে আমার সহজে কান্না করত না। সেদিনও কান্না সহ্য করেছিল। সেদিন জোর করে স্কুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটাই হল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। সেদিন যদি মেয়ের কথা শুনতাম।
ভেবেছিলাম, স্কুলে পৌছে দিয়ে মেয়ের রাগ ভাঙানোর জন্য মেয়েকে একটা চকোলেট কিনে দিব। কিন্তু মেয়ে আমার বাবার প্রতি রাগ নিয়েই দুনিয়া থেকে চলে গেল।

এই কথাটা বলে রফিক আংকের সেখানেই হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন।

রাবেয়া তাকে শান্ত করার ভাষাটাও খুজে পেল না। আন্টি হয়তো রফিক আংকেলের কথা শুনতে পারছে। যার কারনে, তার চোখটাও হয়তো ভিঁজে আসছে। কিন্তু রাবেয়ার সেটা দেখার সাহস হল না।
রফিক আংকেল রুম থেকে বের হয়ে গেল। রাবেয়া ধপাস করে পাশে থাকা বিছানায় বসে পরল। আন্টির সামনে যেতে লজ্জা করছে। তবুও রাবেয়া লজ্জা কাঁটিয়ে আন্টির পাশে গিয়ে দাড়াল। আন্টি এখনো বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু রাবেয় দেখতে পারল তার শরির মৃদু কাঁপছে। যেন অতীতের সৃতিগুলো মনে পড়েছে। সুস্থ থাকলে হয়তো তিনিও এখন রফিক আংকেলের মতো কান্না করত।
রাবেয়া আন্টির কাধে হালকা করে হাত রাখল। আন্টির শরিরের কোন পরিবর্তন হল না। রাবেয়া তার আন্টিকে উদ্দেশ্য করে বলল, চিন্তা করবেন না, আন্টি! দেখবেন সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।
আন্টি হয়তো মনে মনে বলছে, কিছুই ঠিক হবে না। যেই মানুষটা চলে গেছে, সে কি আর কখনো ফিরে আসবে?

কিছুক্ষন পরে একজন মহিলা রুমে আসল। মোটাসোটা মহিলা। গায়ে মনে হয় অনেক শক্তি। মহিলাটা রাবেয়াকে আগে কখনো দেখে নি! তাই সে বলল, তুমি কে গো?
- এই বাড়ির আত্বিয়।
- উনি কে হয় তোমার?
- আন্টি হয় আমার।
ঘড়ে একটা হুইলচেয়ার ছিল। মহিলাটা সেটা আনল। এনে আন্টি পাশে রাখল। আস্তে করে আন্টিকে দাড় করালেন এবং হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিলেন।
রাবেয়া বলল, আচ্ছা! আপনি কে?
মহিলাটা কিছুক্ষন চুপ করে থাকল। হয়তো কথা তৈরি করল। তারপর বলল, তোমার আন্টি তো চলাফেলা করতে পারে না। আর রফিক সাহেব তো সারাদিন ব্যাস্তই থাকে। উনাকে দেখাশোনা করার তো কেউ নেই। তাই আমিই উনার দেখাশোনা করি। আমার নাম করিমা। পাশেই থাকি। শুধু দুইটা ছেলে আছে।
মহিলাটিকে রাবেয়ার পছন্দ হল। তার গায়ের রঙ শ্যামলা। মাথার চুল খোঁপা করে বাঁধা। মহিলাটা আন্টিকে অসুধ খাইয়ে দিল। এই প্রথম রাবেয়া তার আন্টির মুখ নড়তে দেখল। বেশি নড়ায় না। একটু একটু করে পানির গিলল।

রাবেয়ার দিনগুলো ভালোই কাঁটতে লাগল। বেশিরভাগ সময় আন্টির রুমে গিয়ে বই পড়ে। আন্টি মনে হয় আগে অনেক বই পড়ত। রাবেয়া মাঝে মাঝে জোড়ে জোরে বই পড়ে। যাতে আন্টি শুনতে পায়। আন্টি শুনে, আসলেই শুনে। কথাটা মুখ দিয়ে বলতে না পারলেও দুটি চোখ ঠিকই বলে যে, আমি শুনছি।
রফিক আংকেল রাবেয়ার ঘুম ভাঙ্গার আগেই অফিসে চলে যায়। রাতে দেখা হয় উনার সাথে।

প্রথম রফিক আংকেল রাবেয়ার প্রতি যেমন মায়া দেখিয়েছিল, সেই মায়া এখন আর তার মধ্যে নেই। নিজে ব্যাস্ত মানুষ। তাছাড়া তিনি বুঝতে পেরেছেন, নিজের মেয়ে রাবেয়ার সাথে বর্তমান রাবেয়ার কোন মিল নেই।

কয়েকদিনের মধ্যেই করিমা আন্টির সাথে রাবেয়ার ভালো একটা সম্পর্ক হয়ে গেল। করিমা আন্টির ছোট ছেলেটা রাধুনি। শহরের একটা দামী রেস্ট্রুরেন্টে রান্নার কাজ করে। করিমা আন্টি মাঝে মাঝে তার ছেলেকে নিয়ে অনেক প্রশংস করে। সেগুলো রাবেয়া মন দিয়ে শুনে।
আজকেও ছেলেটা করিমা আন্টির মাধ্যমে রফিক আংকেলের স্ত্রীর জন্য কি যেন একটা রান্না করে এনেছে। রাবেয়া জানতে চাইল করিমা আন্টির কাছে।
সে বলল, পায়েস।
আরো বলল, ভাবীর পায়েস অনেক পছন্দের। বিশেষ করে আমার ছেলের হাতের। আজকে ছেলেটা ভাবীর জন্য পায়েস রান্না করে পাঠিয়ে দিল।
রাবেয়া মজার ছলে বলল, আপনার ছেলের এতো গুনাগুন গাইছেন- তাহলে একটু পায়েস আমার জন্য রান্না করে আনতে পারে না?
- বলবোনি। কালকে আসার সময় রেঁধে দিবে।
- মনে থাকে যেন।
- আমি সহজে কিছু ভুলি না।

করিমা আন্টি সত্যি সত্যি তার পরের দিন রাবেয়ার জন্য পায়েস নিয়ে আসল। রাবেয়া তো এটা ভাবতেই পারে নি।
রাবেয়া খুশি হয়ে বলল, এটা আমার জন্য?
- তোমার নয়তো কি?
- আমার কথা আপনার ছেলেকে বলেছিলেন?
- বলেছিলাম। তার জন্যই তো রান্না করে দিলো।
রাবেয়া পায়েসটা মুখে দিয়ে বলল, দারুন তো! আপনার ছেলে শিখলো কার কাছে?
- ইচ্ছা থাকলে সব শেখা যায়। তুমি চেষ্টা করলে তুমিও পারবে।
- আপনি পারেন না?
- পারি তবে আমার ছেলের মতো অতটা ভালো পারি না।

এই কয়দিনের মধ্যেই রাবেয়া ফাতেমা আন্টিকে ভুলে গেছে। যদিও মাঝে মাঝে তার কথা মনে হয়। কিন্তু আফসোস হয় না। আর কিছুদিনের মধ্যেই রাবেয়ার কোলে একটা বাচ্চা আসবে। কিছুদিন আগে রফিক সাহেব রাবেয়াকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। রাবেয়ার আট্রাসনোগ্রাফি করে জানা যায় তার একটা ছেলে বাচ্চা হবে। তাই রাবেয়াও অনেক খুশি। কিন্তু ছেলেটার কি নাম রাখা যায়? কিছুদিন ধরে সেটাই ভাবছে রাবেয়া।
আজকে রায়হান যদি বেঁচে থাকত! তাহলে সে হয়তো অনেক খুশি হত। সেটা ভেবে সে এখনো কষ্ট পায়।

আজকেও শুক্রবার। রাবেয়া ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছিল। কোত্থেকে যেন করিমা আন্টি এসে বলল, রফিক ভাই তোমাকে তার ঘড়ে যেতে বলল।
কথাটা বলেই তিনি ফুড়ুৎ করে চলে গেল। কিসের জন্য ডাকছে সেটা বলার সময়ই পেল না।

অগত্যা চুল আঁচড়ানো বাদ দিয়ে রাবেয়া রওনা হল। এখন রাবেয়া সিড়ি দিয়ে ভালোমতে নামাতে পারে না। খুব সাবধানে নামতে হয় তাকে। যদি কোনভাবে সিড়ি থেকে পড়ে যায়, তাহলে বিপত্তি আরেকটা বাঁধবে।
রাবেয়া আস্তে আস্তে করে নামা আরাম্ব করল। রফিক সাহেব তো কখনো রাবেয়াকে ডেকে পাঠায় না! আজকে তাহলে ডাকছে কেন? কোন সমস্যা হয়েছে কি?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতেই ডান পায়ে একটা মোচড় খেল রাবেয়া। উফ্ করে বসে পড়ল সে। সিড়ির রেলিংটা ধরে কোনমতে উঠতে পারল ঠিকই। কিন্তু হাঁটতে পারল না। অগত্যা আবার বসে পড়ল সে। ভালোই জোরে লেগেছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই পা-টা ফুলে কালো হয়ে গেল।

রাবেয়া আবার উঠতে গিয়েও বসে পড়ল। পা-টা হয়তো মচকে গেছে। আসেপাশে রাবেয়াকে দেখার মতো এখন কেউ নেই। রাবেয়া আবার উঠতে গিয়েও কোন লাভ হল না। অগত্যা কিছুক্ষন সেখানেই বসে থাকতে হল।
পাঁচ ছয় মিনিট অতিবাহিত হওয়ার পর বাসার সিড়ির নিচে একটা ছেলেকে দেখতে পেল রাবেয়া। ছেলেটা এদিকেই আসছে। কিসের জন্য আসছে সেটা সে জানে না।
ছেলেটা রাবেয়াকে একটুর জন্য দেখে নিল। ছেলেটা রাবেয়ার চাইতে একটু বয়সে বড় হবে হয়তো। ছেলেটা চলে যেতে গিয়েও রাবেয়ার দিকে আরেকবার তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। হয়তো সে রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে রাবেয়ার অবস্থা বুঝতে পেরেছে।
রাবেয়া দেখল ছেলেটা তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটুর জন্য হলেও রাবেয়া লজ্জা পেল। কিন্তু বেশি পেল না। কারণ, এই মুহুর্তে তার সাহায্যের জন্য একজনকে দরকার।

- আপনার মনে হয় কোন সমস্যা হয়েছে।
- না। তেমন কিছু না। পায়ে একটু ব্যাথা পেলাম। আপনি যান, আমি উঠতে পারবো।
ছেলেটা রাবেয়ার পায়ের দিকে একনজর তাকাল। তারপর ছেলেটা বলল, আমি বুঝতে পারছি, আপনার পা অনেক ফুলে গেছে। সেটা আমার কাছ থেকে লুকাতে পারবেন না।
রাবেয়া ভাবল, আর মিথ্যে বলে লাভ নেই।
রাবেয়া ছেলেটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ছেলেটা একটুর জন্য বিব্রত হয়ে গেল। হাতটা কি আসলেই ধরবে?
রাবেয়া বলল, উপকার যদি করতেই চান, একটু আমাকে টেনে তুলুন প্লীজ।
ছেলেটাও আস্তে আস্তে হাত বাড়ি দিল। যদিও রাবেয়া নিজে নিজেই দাঁড়াতে পারত। তবুও সে ছেলেটার হাত ধরে উঠে পড়ল।
রাবেয়া বলল, এই কয়েকধাপ সিড়ি আমাকে একটু নামিয়ে দিলেই হবে।
রাবেয়া ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল। কাঁধে হাত রেখে আস্তে আস্তে নিচে নামতে লাগল

রাবেয়া।
রাবেয়া ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, আপনাকে তো আগে কখনো এই বাসায় দেখিনি!
- আসিনা এখানে।
- কেন আসেন না?
- এটা তো আমার বাসা না?
- তাহলে আপনার বাসা কোনটা?
- আপনি বেশি কথা বলেন। এতো কিছু জেনে লাভ কি?

রাবেয়া আর কথা বাড়াল না। চুপ করে রইল। সিড়ির আর কয়েকধাপ নামতে হবে। তাই আর কোন সমস্যা হবে না। ছেলেটা বলল, আমার নাম রাকিব? আপনার নামটা কি জানতে পারি? রাবেয়া বলল, আমার নাম রাবেয়া।
ছেলেটা আবার বলল, আপনার বাসা কোথায়?
- আমিও আপনাকে এসব বলবো না।
- ও! তাই নাকি? ঠিক আছে। বলা লাগবে না।

সিড়ি থেকে নেমে রাবেয়া বলল, থাক। আমাকে আর সাহায্য করা লাগবে না, আপনি যেতে পারেন। রাকিব বলল, আমি গেলাম তাহলে, পরে দেখা হবে।

রফিক সাহেব রাবেয়াকে হাসপাতালে নেওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। রাবেয়া রফিক সাহেবের রুমে খুড়িয়ে খুড়িয়ে যেতে দেখে বলল, একি! এমন করে হাঁটছ কেন?
- পায়ে ব্যাথা পেয়েছি।

সারাদিন রাবেয়াকে হাসপাতালেই কাঁটাতে হল। সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলো। পায়ে একটা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন হয়তো বিছানা থেকে উঠতে মানা। এমনিতেই বাসায় লোকজন কম, তারমধ্যে শুয়ে থাকা। একটা বোরিং ব্যাপার।

পরদিন সকালবেলা নতুন একটা চমক খেল রাবেয়া। দরজার পাশে এসে দাড়াল রাকিব নামের সেই ছেলেটা। হাতে প্লেট। রাবেয়া তাকে বলল, বাইরে কেন? ভেতরে আসুন। রাকিব ভেতরে আসল। এসেই বিছানার পাশের টেবিলে প্লেটটা রাখল।
রাবেয়া বলল, কেমন আছেন?
- ভালো। আপনার পায়ের অবস্থা কেমন?
- দেখতেই তো পাচ্ছেন। ব্যান্ডেজ নিয়ে উঠতে পারি না। শয়তান ডাক্তার আমার পা-টা আরো ভেঙে দিয়েছে।
- ডাক্তারের কোন দোষ নেই। আপনিই তো সাবধানে হাঁটতে পারতেন।
- তারমানে সব দোষ আমার?
- না। দোষটা আমার।
- কেন?

- আমি ভুল করে আপনার বাসায় চলে এসেছি।
- বাঁজে কথা বলবেন না। কি এনেছেন ওটা?
- আপনার জন্য আজকে কাচ্চিবিরিয়ানি রান্না করেছিলাম।
- কেন? আমার জন্য কেন? আমি আপনার কে হই?
- তা জানি না। মা রান্না করতে বলল, তাই করেছি।
- মা? ও.... এখন আপনাকে চিনলাম। আপনি করিমা আন্টির ছেলে। আমাকে আগে বলবেন তো। আন্টির মুখে আপনার কত কথা শুনেছি। আপনি নাকি অনেক সুন্দর রান্না করতে পারেন।
- পারি মোটামুটি।
- মোটামুটি কেন বলছেন? সেদিন আপনার হাতের পায়েস-টার দারুন স্বাদ হয়েছিল।
- তাই নাকি? তাহলে আজকের কাচ্চিবিরিয়ানিটা খেয়ে দেখুন। আরো ভালো লাগবে।

রাবেয়ার সাথে রাকিবের ভালোই পরিচয় হয়ে যায়। রাকিব মাঝে মাঝেই রাবেয়ার জন্য নানান কিছু রান্না করে আনে। রাবেয়ারও তাতে খুব ভালো লাগে। এই বাড়িটার মধ্যে রাবেয়ার বেশি ভালো লাগে করিমা আন্টিকে। রফিক আংকেলের স্ত্রীকেও সে অনেক ভালোবাসে। মাঝে মাঝেই তার কাছে গিয়ে সময় কাঁটায়। বর্তমানে রাকিবও রাবেয়ার মন জয় করে ফেলেছে।
....

আজকে রাবেয়ার জন্য বিশেষ একটা দিন। ভোরবেলা রাবেয়ার পেঁটে প্রচন্ড রকমের ব্যাথা আরাম্ব হল। রফিক আংকেল আর ইদ্রিস ভাই দুজনে মিলে রাবেয়াকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। আজকে রাবেয়ার বাচ্চার ১০ মাস ১০ দিন পুর্ণ হয়েছে।
করিমা আন্টি ব্যাপারটা জেনে অনেক খুশি হয়েছে, সাথে রাকিবও। করিমা আন্টি জায়নামাজে বসে মোনাজাত করতে বসল।

আল্লাহ! মেয়েটাকে তুমি একটা নেক সন্তান দিও। বেচারি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছে। ওর সকল কষ্ট তুমি দূর করে দাও।

সকালবেলা হাসপাতাল থেকে সুসংবাদটা আসল। রাবেয়ার একটা ফুটফুটে সুন্দর ছেলে বাচ্চা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রাবেয়া। তবুও মনের মধ্যে বাচ্চা ছেলেটার জন্য একটা আফসোস। নিজের আপন বাবাকে সে দেখতে পারল না। আজকে যদি রায়হান বেঁচে থাকত। অনেক খুশি হত বাবা হতে পেরে। সুন্দর একটা পরিবার হতো তাদের। তিনজনে সুখে থাকত। কিন্তু ভাগ্যে যেটা নেই, সেটা তো চাইলেই পাওয়া যায় না।

রাকিব হাসপাতালে এসেছে। সাথে করিমা আন্টিকেও নিয়ে এসেছে। তিনি যে ঘড়ের কাজের মহিলা, সেটা কেউ বুঝতেই পারবে না। রাকিব এসেই রাবেয়ার বাচ্চাটাকে কোলে নিল। বাচ্চাটা আসলেই সুন্দর। চোখদুটা গোল গোল। চোখের মনীটা ঘণ কালো। রাবেয়ার মতো।

রাবেয়া সম্পুর্ণ সুস্থ আছে। তবে ডাক্তার বলে দিয়েছে, একদিন হাসপাতালে রেষ্টে থাকতে হবে। পরদিন সকালে তারা বাসায় যেতে পারবে।

তাই করা হল। পরদিন রাবেয়া বাসায় চলে আসল। রফিক আংকেলের স্ত্রীর নাম ঝুমা। রাবেয়ার ছেলেকে ঝুমা আন্টির সামনে নিয়ে গিয়ে করিমা আন্টি বলল, এটা কে জানেন? রাবেয়ার ছেলে। ছেলেটার চেহারা সুন্দর হয়েছে না?
ঝুমা আন্টি যেন কিছুটা ঝুকে যেতে চাইছিলেন, মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল। কিন্তু ঝুকতে পারলেন না। করিমা আন্টি বাচ্চাটাকে আরো কাছে নিয়ে গেল। ভালোমতন দেখাল। ঝুমা আন্টি হয়তো ছেলেটার জন্য মনে মনে দোয়া করছিলেন। বলছিলেন, ছেলেটা ভালো থাকুক।

রফিক আংকেলও অনেক খুশি। নিজের মেয়ের জন্মের সময়ও ঠিক তার এমনটা আনন্দ হয়েছিলো। নিজের সন্তানকে যেন সে আবার ফিরে পেয়েছে। ইদানিং মাঝে মাঝেই রফিক আংকেল রাবেয়ার সাথে দেখা করতে আসে। করিমা আন্টি রাবেয়ার ছেলের দায়িত্বটাও নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

রাকিব ছেলেটা মাঝে মাঝে আসে। রাবেয়ার ছেলেটাকে কোলে নেয়। রাবেয়ার সাথে কিছুক্ষন গল্প করে। গল্প করে আবার চলে যাবে।

এভাবেই দিন কাঁটতে লাগল রাবেয়ার। বাচ্চার বয়স ৭ মাসের মতো হয়ে গেছে। রফিক আংকেল নিয়মিত অফিসে যায়। করিমা আন্টি এখনও কাজে আসে। ইদ্রিস মিয়াও কাজে আসে। এমনকি, রাকিবও আসে রাবেয়ার সাথে গল্প করতে। রাবেয়া আর রাকিবের মধ্যে আলাপের ধরনটা অনেক পালটে গেছে। এই যেমনঃ
রাবেয়া বলে, বিয়ে শাদি করবেন না?
- ভালো মেয়ে পেলেই করে ফেলব।
- আচ্ছা! আপনার কেমন মেয়ে পছন্দ?
- আপনাকে বলব না।
- বলেন না! শুনতে ইচ্ছা করছে খুব।
রাকিব কিছুক্ষন ভেবে উত্তর দেয়, ঘণ কালো লম্বা চুল, পরীর মতো চেহারা থাকবে, মায়ায় ভড়া। যাকে দেখলেই প্রেমে পড়তে ইচ্ছা হবে।
- তেমন মেয়ে খুজলে কি পাওয়া যাবে?
- হয়তো আশেপাশেই আছে।
- খুঁজেন তাহলে।
- চেষ্টা করব।

রাবেয়ার ছেলেটার নাম রাখা হয়েছে রাফসান। রায়হানের নামের সাথে মিল রেখে এই নামটা

রাখা হয়েছে। রাফসান এখন ভালোই বড় হয়ে গেছে। রাবেয়াও এখন অনেক সুস্থ।

রাফসানকে করিমা আন্টির কাছে রেখে রাবেয়া একদিন মার্কেটের দিকে যাচ্ছিল। অনেক কিছু কেনাটার প্রয়োজন। সকালে রফিক আংকেলের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বের হয়েছে রাবেয়া। রফিক আংকেল গাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা বললে রাবেয়া বলে, রিকসা দিয়ে চলে যাব। অনেকদিন ধরে রিকসায় উঠি না।
রফিক আংকেল মানা করলেন না। মেয়েটা যা ইচ্ছা করুক। শুধুমাত্র বললেন, সাবধানে যেও, আমি অফিসে গেলাম, আজকে ফিরতে একটু রাত হবে। ঝুমাকে একটু দেখো।

রিকসায় উঠে পরল রাবেয়া। মার্কেট বেশি দূরে না। যেতে আধঘণ্টার মতো লাগবে। অর্ধেক পথ আসার পর রাবেয়া দেখতে পেল হেঁটে হেঁটে রাকিব ছেলেটা আসছে। রাবেয়া দ্রুত রিকসা থামাতে বলল। আর রাকিবকে ডাকল,
- এইযে... শুনছেন? এইযে... আমি.... আপনাকে বলছি!
রাকিব ছেলেটা কিছুক্ষন এদিক ওদিক তাকানোর পর রাবেয়াকে দেখতে পারল। তখন রাবেয়া হাত দিয়ে ইশারা করে ছেলেটাকে আসতে বলল। ছেলেটা দুপাশের গাড়ি দেখে রাস্তা পার হয়ে রিকসার কাছে আসল। এসেই রাবেয়াকে বলল, একি? কোথায় যাচ্ছেন আপনি?
- আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাচ্ছি। তা আপনি এখানে কেন?
- কি যে বলেন। আমার বাড়ি এখানে। আর আমাকে বলছেন, আপনি এখানে কেন? আজব তো।
- বুঝেছি। আমি মার্কেটে যাচ্ছি। আমার সাথে যাবেন?
- কেন? দরকার আছে নাকি?
- হ্যা। তবে ব্যাস্ত থাকলে দরকার নেই।
- আমার কাজ রাতে। দিনে আমি ফ্রী।
- তাহলে রিকসায় উঠে পরুন না। আমি একলা মেয়ে মানুষ। একা কোথাও যেতে ভয় করে।

রাকিব ছেলেটা রিকসায় উঠে পরল। দুজনের অনেক আলাপ আলোচনা হল। মার্কেটে গিয়ে যা যা দরকার হল তা তা কিনল। রাকিব একটা জিনিস বুঝতে পারল, রাবেয়া অন্য কোন মেয়ের মতো না। বড্ড সাধারণ মেয়ে। অন্যান্য মেয়েরা যেখানে হাজার হাজার দোকান ঘুড়ে একটা জিনিস কেনে। রাবেয়া তার ব্যাতিক্রম। একটা জীনিস কিনতে একটা দোকানই যথেষ্ঠ। তাছাড়া রাকিব আরেকটা জীনিসও খেয়াল করেছে, রাবেয়া কোন দোকানদারকে নিজের কথা দিয়ে হ্যালুসিনেট করতে পারে। ফলে দোকানদার কম দামে ভালো জীনিস দিতে বাধ্য।

রাবেয়া মার্কেট করল অনেক্ষন। তারপর অর্ধেক ব্যাগ রাকিবের হাতে দিয়ে বলল, আমাকে বাসায় পৌছে দিবেন। যদিও রাকিব ছেলেটা একটু সময়ের জন্য বিরক্ত হলো, কিন্তু বললাম না? মেয়েটা সবাইকে হ্যালুসিনেট করতে পারে। তাই রাকিবের রাজি হতে হল।

দুজনে রিকসায় উঠল। অর্ধেক পথ আসার পর রাকিব বলল, আমাদের গরিবের বাড়িতে

যাবেন?
- এখান থেকে কত দূর?
- বেশি দুড়ে না। এখানেই।
- এতোগুলা ব্যাগ নিয়ে?
- চিন্তা করবেন না! আমি সবগুলা নিয়ে যাব।
- নাহ্! আজ থাক। পরে একসময় যাব। আন্টি কি বাড়িতে আছে?
- এখন নেই।
- যখন আন্টি বাড়িতে থাকবে। তখন যাবো।
- আপনার যেটা ইচ্ছা।

রাফসানের জন্যও মার্কেট করেছে রাবেয়া। এই নয় মাসের মধ্যেই যেন রাফসান অনেক বড় হয়ে গেছে।

আজকেও রিকসায় উঠেছে রাবেয়া আর রাকিব। সাথে রাফসানও আছে। গন্তব্য, রাকিবদের বাড়িতে। আজকে করিমা আন্টিও বাড়িতে আসে। সবাই মিলে কিছুক্ষন গল্প করা যাবে। রিকসা থেকে নেমে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হয়। তবে রাবেয়ার কোন সমস্যা হলো না।

রাকিবদের ঘড়টা বেশ বড়সর। টিনের ঘড়। কিন্তু দেখতে সুন্দর। রাবেয়াদেরও এরকম বাড়ি আছে। কিন্তু কেউ থাকে না। তার বাবা মারা যাওয়ার পর হয়তো ঘড়টার অবস্থা জঘন্য হয়ে গেছে। একদিন গ্রামের বাড়ি যেতে পারলে ভালো হতো।
আজকে করিমা আন্টি নিজে রাবেয়ার জন্য অনেক কিছু রান্না করেছে। নানা রকম জিনিস। কয়টা খাবে সে।
তারা অনেক্ষন গল্পসল্প করল। আশেপাশ থেকেও কয়েকটা মহিলা এসে সেই আড্ডায় যোগ দিল। রাবেয়ার পরিবারের গল্প, তার মা কেমন ছিল, কেমন করে মারা গেল, তার বাবা কেমন করে মরল, এসব ঘটনা সবাইকে বলল। এর মাঝে বলতে বলতে একবার রাবেয়ার চোখটা ভিঁজে আসল। একটা মহিলা রাবেয়াকে শান্তনা দিয়ে বলল, আল্লা যা করে! তা ভালার নিগাই করে। তুমি চিন্তা কইরো না। একদিন সব ঠিক হইয়া যাবো।

আরো অনেক ধরনের আলাপ আলোচনা চলল তাদের মধ্যে। কিছুদিন আগে জব্বারের বাবা গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে। জব্বারের মা সেই ঘটনাটাই রাবেয়াকে শোনাল।
এখানেই রিকসা চালাত জব্বারের বাবা। একদিন সকালে রিকসা নিয়ে বের হলেন ঠিকভাবে। কিন্তু বাড়িতে আসলেন লাশ হলে। কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছিল লাশটাকে! পেঁটের উপর দিয়ে ট্রাকের চাকা গিয়েছিল। লাশটা কিভাবে ধোঁয়াবে, সেটা নিয়েই অনেক ধরনের কথাবার্তা চলছিল। এমন বিভৎস লাশ কেউ ধোঁয়াতে চাইছিল না। লাশ দেখে কয়েকজন নাকি বমিও করে দিয়েছিল। শেষমেশ কোনরকম পানি ঢেলে গোছলের ফরজগুলো আদায় করে, তারপর কবর দেওয়া হয়েছিলো।

এরকম গল্প শুনে রাবেয়ার নিজেকে একা মনে হয় না। রাবেয়ার মতো হাজার হাজার মানুষ এই শহরে আছে। হয়তো তাদের কষ্ট রাবেয়ার চেয়েও বেশি। তাছাড়া রাবেয়া তো এখন শান্তিতে আছে। আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছে। সে এমনই একটা পরিবার চেয়েছিল। এবং সেটা পেয়েছেও। সুতরাং রাবেয়া এখন সুখি মানুষ। যার কোন কষ্ট নেই। কষ্ট তো তাদের, যাদের এখনো থাকার জায়গা নেই, মাথার উপরে ছাদ নেই, খাওয়ার কিছু নেই।
সেদিন গল্প চলল অনেক্ষন। বাসার ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

শনিবার। বিছানায় শুয়ে আছে রাবেয়া। শরিরটা খারাপ। কালকে বৃষ্টিতে ভিঁজতে ইচ্ছে করছিল। অনেকদিন পর ভেঁজার জন্য হালকা সর্দি লেগে গেছে। পাশেই রাফসান ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রফিক আংকেল। রাবেয়া নিজের গায়ের জামাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে উঠে বসল। রফিক আংকেল বলল, শরিরটা ঠিক আছে তো?
- মোটামুটি। সেটা নিয়ে চিন্তা করবেন না। একাই ঠিক হয়ে যাবে।

রফিক আংকেল রাবেয়া পাশে এসে বসল। তারপর নিজের হাতটা রাবেয়ার কপালে রেখে সেটা গাল পর্যন্ত টেনে আনলেন। প্রচন্ড লজ্জা পেল রাবেয়া। একটু পিছিয়ে গেল সে।
রফিক আংকেল বলল, অসুধ এনে দেব?
রাবেয়া বলল, সেটার দরকার হবে না। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি ঘুমাবো।
তখনি রফিক আংকেল রাবেয়ার আরেকটু কাছে গিয়ে রাবেয়ার একটা পায়ের আংগুলের মধ্যে হালকা স্পর্শ করলেন। রাবেয়া আবার নিজের পা-টা সরিয়ে নিল। তারপর আংকেল বললেন, এতো উতলা হয়েছো কেন? অনেকদিন ধরে তোমার সাথে গল্প করতে আসি না। আজকে সময় পেয়ে একটু আসলাম।
রাবেয়া বলল, ঠিক আছে। একটু পরে বাইরে গিয়ে অনেক্ষন গল্প করা যাবে।
- না। এখানেই গল্প করি না!
- আমি ঘুমাবো।
এই কথা বলার পর রাবেয়া নিজের গায়ে চাদর মুড়িয়ে রাফসানের পাশে শুয়ে পড়ল।
রফিক আংকেল এই জিনিসটা হয়তো ভালো চোখে দেখল না। রাবেয়ার রুমে দুই মিনিট বসে থাকার পর উপায় না পেয়ে চলে গেল।

রফিক আংকেল যাওয়ার পর গা থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলল রাবেয়া। বড্ড গরম আজকে। মাথার উপরে যদিও ফ্যান চলছে।
রাবেয়া ভাবতে লাগল, রফিক আংকেলের ব্যাবহার এমন হটাৎ করে পালটে গেল কেন?

সেদিন রাবেয়া কোন কাজ করল না। সারাদিন বসে থাকতে ভালো লাগেনা রাবেয়ার। মাঝে মাঝে করিমা আন্টির সাথে এটা ওটা টুকটাক কাজও করে। যে মেয়েটা রান্নাবান্না করে, তাকে একটু সাহায্য করে রাবেয়া। এসব করতে ভালোই লাগে। রাফসান কান্না করলে আবার চলে যায়।
রান্না করার মেয়েটা বলে, আপু! তোমার রান্না করার দরকার নেই। তুমি তোমার ছেলের কাছে

যাও। কিন্তু রাবেয়া মেয়েটার কথা শোনে না। রাবেয়া বলে, বসে থাকতে ইচ্ছা করে না। কাজ করার জন্য হাতটা উতলা হয়ে থাকে সবসময়। তার তাছাড়া আমি কি সাহেবের মেয়ে নাকি? যে সারাক্ষন ঘড়ে বসে কাঁটাব? শোনো, ছোটবেলায় গ্রামে বড় হয়েছি। এসব কাজ আগে অনেক করেছি। আমাকে এসব বলে লাভ নেই। মেয়েটা বলে, তোমাকে বোঝানো কঠিন। তুমি যা ইচ্ছা কর।

কিছুদিন রাকিবকে দেখা যাচ্ছে না। কোথায় থাকে ছেলেটা সারাক্ষন। করিমা আন্টিকে বলায় সে বলল, কিছুদিন ধরে কাজের অনেক চাপ তো- তাই আসতে পারে নি। আজকে আবার শরিরটাও ভালো নেই। অনেকবার বললাম, কিছুদিন বিশ্রাম নে। এতো কাজ করে কী লাভ। কিন্তু ছেলেটা শুনলোই না। আজকে সকাল থেকে জ্বর। বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না।
রাবেয়া মুখ হা করে বলল, বলেন কি? অনেক শরির খারাপ? তাই তো বলি। আগে অনেক দেখা করত, এখন দেখাই হয় না। ভাবছি কালকে একবার আপনার ছেলেকে গিয়ে দেখে আসব।
করিমা আন্টি খুশি হয়ে বলল, যেও। গেলে খুশিই হবো।

আজকে শনিবার। রাবেয়া খেয়েদেয়ে রেডি হয়ে নিল। খাওয়ার পর রাফসানকে করিমা আন্টির কাছে দিয়ে রাকিবদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

পৌছানোর পর রাবেয়া দরজায় নক করল। কিছুক্ষন পর রাকিব দরজা খুলল। রাকিব অপর পাশে রাবেয়াকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে বলল, আমি স্বপ্নে দেখছি নাতো?
রাবেয়া হেঁসে জবাব দিলো, আমি কি শুধু স্বপ্নেই আসি? বাস্তবে আসতে পারি না?
- হুম। আসতে নিষেধ করেছে কে? আসুন আসুন ঘড়ে এসে বসুন।

রাবেয়া ঘড়ে গেল। রাকিব দাঁড়িয়ে রইল। রাবেয়া বলল, আপনার নাকি শরির খারাপ?
- কিছুটা।
- তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।
রাকিব চেয়ারটা টান দিয়ে বসল। বসেই বলল, আপনাকে যে কি খেতে দেই!
- আমি খাওয়ার জন্য তো আসি নি। আপনাকে দেখতে এসেছি। আন্টির কাছে শুনলাম, আপনার নাকি শরির খারাপ। তাই এসে পরলাম।
- ওই, একটু জ্বর এসেছিল। এখন অনেকটা কমে গেছে।
রাবেয়া বলল, মিথ্যা বলছেন কেন? আমি অতটা বোকা মেয়ে না। আপনার বালিশের পাশে ভেঁজা রুমাল কেন? নিশ্চই এটা এতোক্ষন কপালে দেওয়া ছিল।
রাবেয়া বিছানা থেকে উঠে রাকিবের কাছে গিয়ে রাকিবের কপালে হাতটা রাখল। রাকিব যেন অনেকটা চমকে গেল। এই প্রথম রাবেয়া ইচ্ছা করে রাকিবকে স্পর্শ করল।

রাবেয়া বলল, ইস! এতো খারাপ কেন আপনি? আপনার তো অনেক জ্বর। তারপরেও দিব্বি আমার সাথে সুস্থতার অভিনয় করে যাচ্ছেন। যান! বিছানায় গিয়ে শুয়ে থাকুন। আপনার উঠার

দরকার নেই।
- আরে না। আমি সুস্থই আছি। আপনিই বসুন।
- আমি এসেছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন তাই না? আমার জন্য বসে আছেন।
- কি বিপদ বাবা। ঠিক আছে। আমি বিছানায় যাচ্ছি। আপনার সাথে কথা বলে কেন যে প্রতিবার হেরে যাই!

রাকিব বিছানায় শুয়ে পরল। তারপর বলল, বাড়িতে কোন মেহমান আসলে কিছু আনতে হয় জানেন না? আমি তো অসুস্থ। আমার জন্য কি এনেছেন?
- ইস। ভুলে গেছি। কিছু আনতে মনে নেই।
- এই আপনার দেখতে আসা?
- সত্যি! দ্রুত আসতে গিয়ে কিছু মনে নেই। আমাকে ক্ষমা করুন প্লিজ।
- ঠিক আছে। আর যেন কখনো এরকম হয় না।
- চেষ্টা করব। আপনার জন্য আবার আমি কি করব? আপনিই তো অনেক সুন্দর রান্না করতে পারেন।
- তাই বলে আমার জন্য আপনি কিছুই আনবেন না?
- ওকে! হয়েছে বাবা। এখন থেকে আর ভুল হবে না। যখনি আপনার সাথে দেখা করতে আসব তখনি কিছু নিয়ে আসব।
- থাক এসব। আগে বলুন, রাফসান কেমন আছে?
- ভালো আছে।
- নিয়ে আসলেন না কেন?
- রাস্তায় অনেক ধুলা। ছেলেটার মনে হয় ধুলোয় এলার্জি আছে। শরির লাল হয়ে যায়। তাই আনিনি। আপনার মায়ের কাছে রেখে এসেছি।
- ভালো হয়েছে। আচ্ছা! রফিক আংকেল কেমন আছে?
রফিক আংকেলের কথা শুনে রাবেয়া কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। রাকিব বলল, কি হল?
রাবেয়া বলল, ভালো আছে।
রাবেয়া প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, আপনি একটা ভালো ডাক্তার দেখান।
- আমি বললাম না?- আমি সুস্থ আছি।
- এই আপনার সুস্থ? গা আগুনের মতো গরম। আপনার কপালের রুমালটা শুকিয়ে গেছে। দাঁড়ান, আমি রুমালটা ভিঁজিয়ে আনছি।

এই বলে রাবেয়া বিছানা থেকে রুমালটা নিয়ে জগে রাখা পানি দিয়ে সেটা ভিঁজিয়ে আনল। তারপর রাকিবের কপালে আলতো করে সেটা দিয়ে দিলো।
রাকিব বলল, কি দরকার বলুন তো? আমার মতো সামান্য একজন মানুষকে এভাবে যত্ন করে। বিনিময়ে তো আপনাকে কিছু দিতে পারি না।
- আমি তো আপনার কাছে কিছুই চাই নি।

সেদিন অনেক কথা বলল দুজনে। এতোদিনে রাবেয়ার একটা কথা খেয়াল হল, রাকিবকে যেন একটু বেশিই কল্পনা করছে সে। কেন এমনটা হচ্ছে? রাবেয়া মাঝে মাঝে ভাবে, আমি কি তাহলে ছেলেটার প্রতি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছি?

এদিকে বেচাড়া রাকিবও মনে মনে কল্পনা করে রাবেয়ার কথা। সেও কি রাবেয়ার প্রতি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে? হবারই তো কথা, মেয়েটা কেন এতো যত্ন করে তাকে? মাঝে মাঝেই কেন দেখতে আসে তাকে?

রাবেয়ার বয়স কম। এই বয়সটাতে অনেক কিছুই ছেলে-মেয়েরা কল্পনা করে বসে। যত দিন যায় দুজনের সম্পর্কের ভিত্তি আরো মজবুদ হতে থাকে। একদিন রাকিবের সাথে কথা না বললে যেন ভালোই লাগে না।

একদিন রাবেয়া আর রাকিব ঘুড়তে গেছিল। হয়তো শপিং করতে। কিন্তু রফিক সাহেব ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখল না। রাতে বাসায় যখন কেউ ছিল না তখন রফিক আংকেল রাবেয়ার রুমে আসে। রাফসান ঘুমাচ্ছিল। রাবেয়াও ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। দরজার শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকাল। রাবেয়া দেখে, দরজার সামনে রফিক আংকেল দাঁড়িয়ে আছে। শুধু দাঁড়িয়েই নয়, রাবেয়ার শরিরের দিকে তাকিয়ে আছে। রাবেয়া বিছানার পাশ থেকে উড়নাটা তুলে নিয়ে পড়ে নিল।

রফিক আংকেল রাবেয়ার খাটের কাছে এসে বলল, কিরে? বড্ড বেড়ে গেছিস দেখছি।
আংকেলের মুখে তুই শব্দটা শুনে একটু চমকে গেল সে।
রফিক আংকেল বলতে লাগল, ওই ছেলেটার সাথে এতো ভাব কেন তোর? আজকেও দেখলাম দুজনে একসাথে কোথা থেকে যেন আসলি। তাও আবার দুজনে হাসতে আসতে। কেন রে? এতো মিল কেন তোদের? কোথায় গিয়েছিলি বলতো?
- ঘুড়তে।
- একটা বাইরের ছেলের সাথে ঘুড়তে যেতে লজ্জা করে না। তোর তো একটা ছেলে আছে। তারপরেও তুই এসব করে বেড়াস?
- আপনি যেটা ভাবছেন। সেটা না।
- আমি যেটা ভাবছি তার চেয়েও খারাপ কিছু করেছিস তুই?
- বলেন কি করেছি আমি?
- বল? ছেলেটার সাথে কয়দিন রাত কাটিয়েছিস?
- ছি আংকেল। এসব কথা বলতে আপনার লজ্জা করছে না? সত্যি করে বলুন তো? আপনার কি হয়েছে? কিছুদিন ধরেই আপনার মধ্যে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করছি।
- পরিবর্তন আমি হই নি। হয়েছিস তুই। আগে তো এমন ছিলি না? এখন বড় লোক হয়ে গেছিস! আবার প্রেমও করছিস। কিছুদিন পর শুনবো....

কথাটা বলল না রফিক আংকেল। প্রসঙ্গ পালটিয়ে বলল, কালকে সকালের মধ্যে এই বাড়ি

থেকে চলে যাবি। নিজের মেয়ের মতো যাকে আদর করতাম, সে কিনা....
রাবেয়া অনুরোধের স্বরে বলল, প্লিজ.. এমনটা করবেন না। আপনাদের ছাড়া তো আমার কেউ নেই এখানে। আমি আমার ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাবো?
- সেটা আমি জানি না। তুই আর এই বাড়িতে থাকবিনা ব্যাস।
রাবেয়া রফিক আংকেলের পায়ে ধরে বলল, আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব, আমাকে এই বাড়িতে পারলে চাকর হিসাবে থাকতে দিন। আমি আর ছেলেটার সাথে কথা বলব না।

রফিক আংকেল রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি এই বাড়িতে থাকতে চাস, তবে আজকে আমার একটা আবদার পুরণ করতে হবে।
রাবেয়া আংকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, কিসের আবদার?
- আজকে রাতটা আমার সাথে কাঁটাতে হবে। থাকবি? অনেক আদর করবো তোকে!
রফিক আংকেলের চোখে যেন এক সাগর পরিমান ক্ষুধা। সেই ক্ষুধা মেটাতেই আজকে রাবেয়ার কাছে এসেছে সে। যেই ক্ষুধা স্ত্রীর মেটানোর কথা ছিল, সেটা যেন আজ জোর করে রাবেয়াকে দিয়ে মেটাতে চাইছে রফিক সাহেব।
রফিক সাহেবের হয়তো আর ধৈর্য হচ্ছে না। ধৈর্যের বাঁধ যেন উপচে ফেঁটে পরতে চাইছে। কতদিন আর ইচ্ছা করে শরিরের ক্ষুধা নিয়ে বেঁচে থাকতে? চোখের সামনে যখন একটা যুবতী মেয়ে তার পুর্ণ যৌবন নিয়ে চলাফেরা করে, তখন নিয়েকে সংযত রাখাটা যেন হাজার গুন কঠিন হয়ে যায়।

রাবেয়া রফিক আংকেলের থেকে ভয়ে অনেকটা দুড়ে চলে গেল। রফিক আংকেলও রাবেয়ার আরো কাছে আসতে লাগল। আর বলতে লাগল, ভয় পাচ্ছিস কেন? আমি তো আংকেল লাগি না? তুই তো আমার মেয়ের মতো। তোকে অনেক ভালোবাসি। আমাকে ভালোবাসবি না? আমাকে আদর করবি না? কাছে আয় প্লিজ....

রাবেয়া যেন আর পারছে না। নিজেকে দুর্বল মনে হচ্ছে। কিন্তু এখন তার শরিরে শক্তির দরকার। অনেক শক্তির দরকার। রাবেয়া যখনি দরজার দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। সেই সময় রফিক আংকেল রাবেয়ার হাত খপ করে ধরে কাছে টেনে নিল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিল সে। এই পরিস্থিতি রাবেয়া আর সহ্য করতে পারল না। ঠাস করে রফিক আংকেলের গালে একটা চড় বসিয়ে দিল।
রফিক আংকেল যেন থ হয়ে গেল। চড়টা জোরেই লেগেছে। মূহুর্তের মধ্যেই গালে আংগুলের দাগ বসে গেল। শব্দে রাফসানের ঘুম ভেঁঙে গেল। রাফসান উঠে বসল। উঠে চোখ কঁচলাতে লাগল।

রফিক আংকেল রাগে অভিমানে রুম থেকে গজ গজ করতে করতে বের হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল, আমার বাড়িতে থেকে আমাকেই অপমান? এটা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই অপমানের ফলাফল আমি দিয়েই ছাড়ব। রফিক আংকেল মেয়েটাকে এনেছিলই কেবল নিজের শারীরিক চাহিদা মেটানোর জন্য। “রাবেয়াকে নিজের মেয়ের মত দেখা যায়”

এই কথাগুলো ছিলো শুধুই মিথ্যা।

নাহ্! এভাবে রাবেয়ার পক্ষে আর থাকা সম্ভব না। যেভাবেই হোক কিছু একটা তাকে করতেই হবে। কিজানি কখন লোকটা কোন খারাপ কাজ করে ফেলে।
রাফসান আবার ঘুমিয়ে গেছে। রাতে একটু সময়ের জন্যও ঘুম আসল না রাবেয়ার। সারাক্ষন মাথার মধ্যে কেবল একটাই চিন্তা। সে তো এই বাড়িতে নিরাপদ নয়। আবার এই বাড়ি ছাড়া কোথাও যাওয়ারও জায়গা নেই।

পরদিনও রাবেয়ার কোন সমস্যা হলো না। রফিক আংকেল সারাদিন অফিসে ছিল। আজকে রাবেয়া একটা মিস্ত্রী ডেকে এনে ঘড়ের লকটা ঠিক করালো। রাবেয়া ঘড়ের লকটা নষ্ট ছিল অনেক আগে থেকেই। রফিক আংকেলের মেয়ে নাকি একবার রুমের ভেতর থেকে দরজা লক করে ফেলেছিল। কিন্তু লকটা আর খুলতে পারছিল না। তাই রফিক আংকেল ধাক্কা দিয়ে লকটা ভেঙে ফেলেছিলো। লকটা আর মেরামত করে নি। যাতে মেয়েটা আর এরকম কাজ না করতে পারে।
সেই লকটাই রাবেয়া ঠিক করে নিল। রফিক আংকেল বাসায় আসলে হয়তো সেই কাজটি করা যেত না।

সেদিনের পর থেকে রফিক আংকেল আর রাবেয়াকে কিছু করতে পারে না। রাতের বেলা রফিক আংকেল এখন আর আসে না। কিছুদিন তাই ভালোই শান্তিতে আছে রাবেয়া। তবে দিনের বেলা রফিক আংকেল রাবেয়ার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলার চেষ্টা করে। দিনের বেলার রুপ দেখে বোঝাই যায় না যে এই লোকটা সেদিন রাতে কি করেছিলো।

রাকিব আজকে আসতে বলেছে রাবেয়াকে। দুজনে একটা পার্কে দেখা করবে। তার জন্য রাবেয়া রেডি হচ্ছে। সাথে রাফসানকেও নিয়ে যাবে। রাফসানকেও সুন্দর করে সাজিয়ে দিল রাবেয়া।
রাবেয়া পার্কে গিয়ে দেখল, রাকিবকে আজকে অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে। একটা নীল পাঞ্জাবী, হাঁতা কুচানো। চুলগুলা সুন্দর করে পরিপাটি করা। রাবেয়াকে দেখেই রাকিব এগিয়ে আসল। তারপর বলল, কেমন আছো রাবেয়া?
- ভালো। আপনি?
- ভালো। চল, একটা জায়গায় গিয়ে বসি।
- আচ্ছা।
দুজনে হাঁটতে লাগল। হাঁটার সময় রাবেয়া জিজ্ঞেস করল, হটাৎ করে আমাকে তুমি করে বলার কারন কি?
- এমনি। অনেকদিন ধরে পরিচয় আমাদের। আপনি আপনি বলতে আর ভাল্লাগে না।
রাবেয়া হেঁসে জবাব দিলো, তাই?
- হ্যা। বলতে পারবো কি?
- আপনার ইচ্ছা।

দুজনে একটা জায়গায় গিয়ে বসল। এখন বিকাল। এই সময়টাতে অনেকেই এই জায়গাটায় আসে। পরিবেশটাও অনেক সুন্দর। আকাশের কিছু অংশ লাল হয়ে আছে। গাছের সবুজ পাতার সাথেও যেন সেই লাল আভা মিশে আছে। অনেক দূরে একটা মড়া গাছে বসে কয়েকটা কাক ডাকছে। কাকের ডাকটাও এই পরিবেশের সাথে খাপ খায়।

রাবেয়া বলে, তো কিসের জন্য ডেকেছ?
রাকিব অবাক হয়ে বলল, তুমিও আমার মতো তুমি করে ডাকছ?
- কেন? ডাকলে অসুবিধা কি?
- না। কোন অসুবিধা নাই।
- এখন বলো। ডেকেছ কেন?
- এমনি। অনেকদিন ধরে তোমাকে সামনাসামনি দেখি না।
- আমাকে দেখে লাভ কি? আমি কি অনেক সুন্দর?
- হয়তো। আর সুন্দর হলেই কি দেখা লাগবে। অন্য কারণ থাকতে পারে না?
- কিন্তু সেটা কি? জানতে পারি আমি?
- রাবেয়া। একটা কথা বলি তোমাকে?
- কি কথা?
- তুমি আমাকে বিয়ে করবে?
কথাটা শোনার জন্য রাবেয়া মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এখন রাকিবের কথার কি উত্তর দিবে সে? রাবেয়ার বড্ড লজ্জা লাগতে আরাম্ব করল।
রাকিব বলল, কি হলো? তুমি কি রাজি? তুমি রাজি থাকলে চলো, আমরা দুজনে বিয়ে করে ফেলি। আমি রাফসানের বাবার দায়িত্ব পালন করতে চাই।
রাবেয়া ভাষা হাড়িয়ে ফেলেছে। আমতা আমতা করে বলল, আমি ভেবে দেখব, এখনি না। এই কথা বলে রাবেয়া সেখান থেকে উঠে পরল আর চলে যেতে আরাম্ব করল। রাকিব পেছন থেকে একবার বলল, ভেবে দেখো কিন্তু। পাত্র হিসাবে কিন্তু খারাপ না আমি। রাবেয়া পেছনে ঘুড়ে রাকিবের দিকে একবার তাকাল। তারপর পরক্ষনেই আবার ঘুড়ে চলে গেল। রাকিবও আর ডাকল না। রাকিব জানে, রাবেয়াও তাকে মনে মনে অনেক ভালোবাসে, ও আবার ফিরে আসবে।

রাবেয়া বাসায় চলে আসল। হাতমুখ ধুয়ে নিল। হাতমুখ ধুতে গিয়ে পানির টেপ চালু অবস্থায়ই বাথরুম থেকে বের হয়ে আসল। কি যে হল আজকে!
আজকে কেন যানি নিজেকে অনেক খুশি মনে হচ্ছে। মন খুলে হাঁসতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কেন? সেটার কারণ কি? রাকিব? রাকিবের জন্য এমনটা হচ্ছে? সত্যিই কি রাবেয়া রাকিবকে ভালোবেসে ফেলেছে। ভালবাসলে এমনটা লাগে বুঝি?

আজকেও বাসায় কেউ নেই। করিমা আন্টিও নাকি ছুটি নিয়েছেন। রান্না করার মেয়েটাও আসে নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাবেয়া রাফসানকে বলে, অই... রাকিব তোর বাবা হতে চায়। হতে

দিবি? অনেক আদর করবে তোকে। অনেক ভালোবাসবে। শেষমেশ ভালোবাসা রাখারই যায়গা পাবি না। দেখিস।
রাফসান যদিও এসব কথা কিছুই বুঝতে পারে না, তবুও রাবেয়া রাফসানের সাথে আরো অনেক্ষন নিজের মনের কথাগুলো বলে। রাফসানও শোনার ভান করে।

রাবেয়া রাফসানকে খুব শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে। রাবেয়া কথা বলতে বলতে একসময় লক্ষ করে রাফসান অনেক আগেই ঘুমিয়ে গেছে। রাবেয়া তাই ছেলেকে সুন্দর করে বালিশে শুয়িয়ে দেয়। তারপর রাবেয়া বারান্দায় চলে আসে। কিছুক্ষন বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

সন্ধ্যা নেমে আসবে একটু পরেই। কয়েকটা পাখি কিচিরমিচির করে গাছের মধ্যে গিয়ে লুকাচ্ছে। হয়তো তাদের বাসাটাই ওখানে।

দুদিন পার হয়ে গেল। দুদিনে রাকিবের সাথে কথা হয় নি। রাবেয়া ইচ্ছা করেই কথা বলে নি। রাবেয়া ভাবে, আগে তো এই ছেলেটার সাথে অনর্গল কথা বলা যেতো। কিন্তু হঠাৎ করে এতোটা জড়তা আসার কারণ কি? লজ্জা?

আজকে রবিবার। আজকের দিনটাও বাকি দিনের মতো ভালোই হতে পারত। কিন্তু একটা ঘটনা রাবেয়ার পুরো জীবনটাকে এভাবে পালটে দেবে। সেটা কেউ জানত না। রফিক আংকেলের আজকে অফিসে যাওয়ার কথা। করিমা আন্টিও নেই। বাসা পুরোটাই ফাঁকা। রাবেয়ার কাজ হল, দুপুরে রফিক আংকেলের স্ত্রীকে খাবারটা আর অসুধটা খাওয়ানো। তাছাড়া আর তার কোন কাজ নেই। রাবেয়া ভেবেছে, আজকের দিনটা অনেক মজা হবে। ফ্রিজে অনেক কিছু আছে, সেগুলা খাওয়া যাবে।
সকাল সাড়ে নয়টার মতো বাঁজে। কি খাওয়া যায় সেটা ভাবছে রাবেয়া। রাফসান এখনো ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক। অসুবিধা নেই। রাবেয়া ফ্রিজের কাছে গেল। ফ্রিজ খুলে দেখতে পেল, অনেক কিছুই আছে। কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা খাবে সে? এটাই চিন্তা করতে লাগল। নুডুলস রান্না করে খেলে কেমন হবে? অনেক দিন ধরেই খায় না রাবেয়া। আজকে বড্ড খেতে ইচ্ছা করছে।
রাবেয়া ফ্রিজ থেকে নুডুলসের প্যাকেট বের করল। এগুলা কি কেউ ফ্রিজে রাখে? নিশ্চই করিমা আন্টির কাজ। কোন খাওয়ার কিছু দেখলেই সেগুলা ফ্রিজে রেখে দেয়।

রান্না ঘড়ে দাঁড়িয়েই রান্না করছিলো রাবেয়া। নুডুলসে মরিচটা মনে হয় একটু বেশিই হয়ে গেল। থাক, সেটা ব্যাপার না। রাবেয়া ঝালও খেতে পারে। সবকিছু ভালোই চলছিলো। এমন সময় খেয়াল করে কে যেন তার কাঁধের উপর হাঁত রাখল। রাবেয়া অনেককটা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। তারপর পেছনের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। ভয়ে রাবেয়ার গা হিম হয়ে গেল। রফিক আংকেলের হাতে একটা ফল কাঁটার চাকু।

রফিক আংকেল তো এই সময় অফিসে থাকার কথা। তাহলে আজকে এই সময় এখানে কেন? তারমানে কি আজকে আংকেল অফিসে যায় নি? রফিক আংকেল রাবেয়াকে উদ্দেশ করে বলল, আজকে যদি আমার কথায় রাজি না হোস। তাহলে এই চাকু দিয়ে তোর জান নিয়ে নিব আমি। তোর ওই ছেলেটাকেও মেরে ফেলব। দেখি এবার তুই কি করতে পারিস। আমাকে তুই চিনিস না।
রাবেয়া এসব কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল। যখন রাবেয়া রফিক আংকেলকে ধাক্কা দিতে যাবে তখনি আংকেল তার মাথার চুল খামচি দিয়ে ধরে ফেলে। ধাক্কা দেওয়াটা আর হলো না।
রাবেয়া কাতর গলায় বলল, প্লিজ.. আমাকে ছেড়ে দিন। এভাবে আমার সর্বনাশ করবেন না। আমি চলে যাবো। এই বাড়ি ছেড়ে অনেক দুড়ে চলে যাবো।
- যেতে তো তোমাকে দিবো না গো সোনা আমার। তুই আমাকে যেই অপমানটা করেছিস তার প্রতিশোধ আমি নিয়েই ছাড়ব। এক বিন্দু ছাড় দিবো না তোকে আমি। দেখি, তুই কি করতে পারিস।
হাতের চাকুটা পাশে রেখে রফিক আংকেল রাবেয়াকে পেছন দিক থেকে জাপটে ধরল। ঘেন্নায় গা রিরি করছে রাবেয়ার। এই খারাপ লোকটার কাছ থেকে বাঁচতে পারলেই এই বাড়ি থেকে চলে যাবে রাবেয়া।

নুডুলস পুড়ে যাচ্ছে। ঘড়ময় গন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু কারো সেটার দিকে খেয়ালই নেই। রফিক আংকেল টান দিয়ে রাবেয়ার ওরনাটা দুড়ে ছুড়ে ফেলে দিল। রাবেয়া নিজের বুক ঢাকতে ব্যাস্ত হয়ে গেল। কিন্তু রফিক আংকেল যেন রাবেরার প্রতি হিংস্র হয়ে গেল। রাবেয়ার ঘাড়ে সে একবার মুখ লাগিয়ে দিল। পুরো শরিরে যেন এক ধরনের শিহরন বয়ে গেল। নিজের চোখ বন্ধ করে ফেলল রাবেয়া। ভাবতে লাগল কি করা যায়।

রাবেয়ার পুরো শরির জুরে রফিক সাহেব ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। রাবেয়াও কিছুটা শান্ত হয়ে গেল। রফিক আংকেল মনে করল, রাবেয়াও হয়তো মুহূর্তটা উপভোগ করছে। তাই তিনি রাবেয়াকে আরো জোরে জাপটে ধরলেন। রাবেয়াও রফিক আংকেলের গায়ে নিজের শরির এলিয়ে দিল। রফিক আংকেল তো মহা খুশি।

কিন্তু তখনই আচমকা একটা অবাক কান্ড করে ফেলল রাবেয়া। হুট করে ঝাকি দিয়ে রফিক আংকেলের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পাতিলে চড়ানো পোঁড়া নুডুলসগুলো নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর সেগুলো রফিক আংকেলের দুটা চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ঘটনাটা ঘটতে তিন বা চার সেকেন্ডের মতো সময় লেগেছে।
কিছু বুঝতে না পেরে "আআআ...." করে একটা ভয়ানক চিৎকার দিলেন রফিক আংকেল। দুই হাত দিয়ে নিজের চোখদুটো চেপে ধরলেন। এমনিতেই গরম তেলে ভাঁজা নুডুলস। তার মধ্যে অনেক ঝাল হয়েছে। রফিক আংকেল যেন যন্ত্রনাটা সহ্য করতে পারল না। ধপাস করে ফ্লোরে পড়ে গেল। আর পানি পানি বলে চিৎকার আরাম্ব করল।
এতোক্ষন রাবেয়া ব্যাপারটা দেখছিলো। নাহ্! আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা ঠিক হবে না। দ্রুত চলে গেল নিজের রুমে।

রাফসান ঘুমাচ্ছে। একটা ছোট ব্যাগ বের করে রাবেয়া সেটার মধ্যে দরকারি সব জিনিসপত্র তুলে নিল। যেমনঃ কয়েকটা কাপড়চোপড় আর কিছু টাকাপয়সা। রাবেয়া চিন্তা করেছে এই মুহূর্তেই সে আর তার ছেলে দুজনে বাড়ি থেকে চলে যাবে।

সময় খুব কম। রাবেয়া নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল। নিজের হাতটাও পুরে গেছে অনেকখানি। হাতের কিছু কিছু জায়গায় ফোস্কা পরে গেছে। কিন্তু অই লোকটার কাছ থেকে রাবেয়া বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছে, এটাই রক্ষা।
রাফসানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পরিপাটি করে দিল। তারপর ওকে কোলে করে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেল।

বের হওয়ার সময় বারে বারে পেছনের দিকে তাকাচ্ছে রাবেয়া। অনেকদিনের মায়া জড়িয়ে আছে এই বাড়িটার মধ্যে। যেতে ইচ্ছা করছে না মোটেও। কিন্তু তবুও বাধ্য হয়ে তাকে যেতেই হচ্ছে। কিচ্ছু করার নাই।
রাবেয়া একটা রিকসায় উঠল। এখান থেকে সে প্রথমে যাবে করিমা আন্টির কাছে। সেখানে গিয়ে অন্য কিছু ভাবা যাবে।
....

রাকিব অনেক ব্যাস্ত কিছুদিন ধরে। কাজের চাপটা একটু বেড়েছে। দুপুরের দিকে বাসায় এসে দরজা খুলতে গিয়ে রাকিব অবাক হয়ে যায়। দরজার ওপাশে রাবেয়া। রাবেয়ার চোখ থেকে অনবরত পানি পরছে।
....
"মেয়েটাকে বিয়ে করে ফেল।", কথাটা বলল করিমা আন্টি। রাকিব বলল, আমি রাজি মা। আমি রাবেয়াকেই আমার বউ হিসাবে পেতে চাই।
রাকিব রাবেয়ার হাত ধরে বলল, চলো কাজি অফিসে। আজকেই বিয়ে করে ফেলব দুজনে।
রাবেয়া কিছুক্ষন যেন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বাধ্য হয়ে রাকিবের সাথে রওনা হল।

দুজনে বিয়ে করে ফেলল। রাবেয়া যেন বিপদ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। করিমা আন্টিও রাবেয়ার সম্পর্কে সমস্ত তথ্য গোপন রাখল।
আজকে করিমা আন্টি কাজে যাওয়ার পর জানতে পারে, রফিক আংকেলের চোখের পাতা নাকি অনেকটা পুরে গেছে। রফিক আংকেল সেটার প্রতিশোধ নিতে চায়। যেভাবেই হোক। রাবেয়াকে সে নাকি খুঁজে বের করে শাস্তি দিবে।

কথাগুলোকে কেউ পাত্তা না দিলেও একদিন রাবেয়া রাস্তা দিয়ে আসার সময় খেয়াল করে কয়েকটা বদ'মাইশ টাইপের লোক রাবেয়ার পিছু নিয়েছে। রাবেয়া প্রথমে কোন পাত্তা না দিলেও পরে ঠিকই বুঝতে পারে যে, আসলেই লোকগুলো রাবেয়ারই পিছু নিয়েছে।

কোনমতে তারাতারি রাবেয়া বাসায় আসে। বাসায় এসেই হাপিয়ে যায়। এভাবে একদিন না, দুদিন না। অনেক দিনই লোকগুলা রাবেয়ার পিছু নেয়। হয়তো তারা সুযোগের সন্ধান করছে। একটু সুযোগ পেলেই রাবেয়ার উপরে হামলা করবে তারা। এটা ভেবেই রাবেয়ার রক্ত হিম হয়ে যায়। বাড়িতে এসে এসব কথা রাকিবকে খুলে বলে। রাকিবও অনেকটা চিন্তায় পড়ে যায়। কি করা যেতে পারে এখন?

করিমা আন্টি সব ঘটনা শুনতে পেয়ে রাকিবকে বলে, একটা কাজ কর বাবা। তুই রাবেয়াকে আর ওর ছেলেকে নিয়া অন্য কোন জায়গায় চলে যা। এখানে থাকাটা তোর আর নিরাপদ হবে না।
তার মায়ের কথায় রাকিব যেন কিছুক্ষণ হা করে হইলো। তারপর বলল, ওদের নিয়ে চলে গেলে তোমার কি হবে? তোমার একা একা কষ্ট লাগবে না?
- আরে না পাগল। আমাকে কি তোর বুড়ো মনে হয়? যে, আমি বাড়ির কাজ করতে পারবো না?
তবে রাকিব কথাটাতে কোনভাবেই রাজি হতে চাচ্ছে না। নিজের মাকে ছাড়া বেশিদিন থাকতে পারে না রাকিব।
কিন্তু করিমা আন্টি বলল, আগে তোর বউকে অই খারাপ লোকদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তারপর নিজের আবেগ নিয়ে চিন্তা করিস।

রাকিব কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। রাকিব এখন পর্যন্তও কখনো মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয় নি। কিন্তু এইবার নিজের স্ত্রীর বিপদের জন্য যেতে হচ্ছে।
করিমা আন্টি বলল, আর দেরি করিস না বাপ। রফিক সাহেবের লোকেরা রাবেয়াকে পেয়ে যাবে। বিপদ কেঁটে গেলে নাহয় আবার আমার কাছে চলে আসবি।

দুদিন পর রাকিব তাদের এলাকা থেকে অনেক দুরে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ পায়। সে চিন্তা করে, রাবেয়াকে নিয়ে সেখানেই বাসা ভাড়া করে থাকবে।
বাসাটা রাকিব সেদিনের মধ্যেই ঠিক করে ফেলতে পারে। তাই সে চিন্তা করল, কালকের মধ্যেই এই বাসায় তারা সেটেল হয়ে যাবে।

যেই ভাবা সেই কাজ। দুজনেই রাতের মধ্যে ব্যাগপত্র গুছিয়ে ফেলল। কালকেই তারা নতুন বাসায় চলে যাবে।
রাকিব একবার তার মাকে বলল, তুমিও চলো আমাদের সাথে?
কিন্তু করিমা আন্টি যেতে রাজি হলো না। বলল, সময় পেলে আমাকে নিয়ে যাস। এই ঘড় ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে নারে।
রাকিব আর জোর করে না। নতুন বাসায় যেতে হলে অনেক ঝামেলা। জিনিসপত্র নেওয়া লাগে, আরো কত কী।

কালকে ভোরেই একটা ছোট ট্রাক ভাড়া করে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তিনজনে নতুন বাসায়

শিফ্ট হয়ে গেলো। যাওয়ার সময় করিমা আন্টি তার ছেলেকে ধরে অনেক কান্না করল। যাওয়ার আগে আন্টি রাবেয়াকে কাছে ডেকে বলল, আমার ছেলেটাকে দেখে রেখো মা।
রাবেয়া উত্তর দিল, আপনিও সাবধানে থাকবেন আম্মা। সাবধানে কাজকর্ম করবেন।
করিমা আন্টি রাফসানের কপালে চুমু দিয়ে রাবেয়াকে বলল, আমার ভাইকে সাবধানে রেখো কিন্তু।

বাসাটা খারাপ না। অতটা বড়ও না। আবার এক্কেবারে ছোটও না। দুইটা রুম। একটা বড়। আরেকটা ছোট। আরেকটা ছোট বাথরুম। একটা বারান্দা আছে। গ্রিল করে আটকানো। বাসাটা রাবেয়ার অপছন্দ হয় নি। নিজেরা নিরাপদে থাকতে পারলেই হলো।

রাবেয়ার দিনগুলো কেমন যানি দ্রুত কেঁটে যেতে আরাম্ব করল। রাকিব বেশিরভাগ সমর কাজে থাকে। রাবেয়া আর রাফসান বাসায় বসে বসে সময় কাঁটায়। এভাবেই চলছিলো অনেকদিন।
বিকালের দিকে কাজ সেরে রাকিব বাসায় এসে পরে। তারপর তিনজনে বাইরে মাঝে মাঝে কোথাও ঘুড়তে যায়। তবে প্রতিদিনই যাওয়া হয় না। বিকালের দিকটায় রাকিব ঘুমায়। মাঝে মাঝে বাজারে যায়। রাতে আবার ঘুমিয়ে যায়।
যেদিন তার কাজের চাপ কম থাকে, সেদিনই কেবল ঘুড়তে যায়। রাবেয়া আর রাফসান বাসায় বসে বসেই দিন কাঁটায়। তাছাড়া আর তাদের কোন কাজ নেই।

কয়দিনের মধ্যে রাবেয়ারা করিমা আন্টির কাছেও একবার গিয়েছিলো। রাকিব একবার তার মাকে বলেছে, আমি আর ওখানে যাবো না মা। এক্কেবারে তোমার কাছে চলে আসব। কিন্তু তার মা ধমকে দিয়েছে। সে বলেছে, এখানের চাইতে ওখানে তোর রোজগার বেশি। এখানে পরে থেকে কি লাভ? তারচেয়ে তুই বরং ওখানেই থাকগে। আমাকে নিয়ে তুই চিন্তা করিস না। আমি এখানেই খুব ভালো আছি।

দুইদিন থাকার পর আবার তারা তাদের বাসায় চলে আসে। রাকিবের মন খারাপ। মায়ের জন্য তার মনটা কেমন জানি করে। রাবেয়ার এসব দেখে অনেক হিংসে হয়। রাবেয়ার মায়ের মৃত্যুতে রাবেয়ার জীবনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো। মায়ের কি এখনই চলে যাওয়ার দরকার ছিলো?

দেখতে দেখতে তিনটা বছর চোখের পলকেই যেন পার হয়ে গেল। রাফসানের বয়স এখন ৪ বছর। রাকিব খেয়াল করেছে, রাফসান অনেক মেধাবী। এই বয়সেই ছেলেটা বই পড়তে পারে। আসলে এটা রাবেয়ারই অবদান। রাবেয়া-ই রাফসানকে বাড়িতেই বই পড়া শিখিয়ে ফেলেছে।

এই কদিনের মধ্যে তেমন কোন ঘটনাই রাবেয়ার জীবনে ঘটে নি। খুব সমান্তরালভাবেই তাদের জীবনটা চলছিলো। কিন্তু একটা ঘটনা আবার রাবেয়ার জীবনটা পালটে দিল। আজকে রাকিব

কাজে যায় নি। বাসায় ঘুমাচ্ছিলো। রাবেয়া বাসার টুকিটাকি কাজ করছিলো। আর রাফসান রাকিবের পাশে বসেই খেলনা দিয়ে খেলছিলো।
দরজায় কে যেন কলিং বেল চাপল। রাবেয়া আর রাকিবকে ডাক দিলো না। লোকটা আবার বিরক্ত হবে। তাই সে নিজেই দরজা খোলার জন্য গেল। দরজা খোলার পর রাবেয়া কিছু কল্পনা করার আগেই দুজন লোক রাবেয়াদের ঘড়ের ভিতর ঢুকে পরল। তারপর একটা ছুড়ি বের করে বলল, অনেক খুজেছি তোমাকে। এইবার আর কোথায় পালাবে তুমি। আজকে আর তোমাকে ছাড়ছি না।

দুজনের মুখেই কালো রুমাল পেচানো। রাবেয়া কাউকেই চিনতে পারছে না। তাই নিজে একটা চিৎকার দিল। রাকিবের ঘুম সাথে সাথেই ভেঙে গেল। রাকিব বিষয়টা বুঝতে পেরে লোকগুলোকে বলল, কে তোরা? এই ঘড়ে কি করছিস?
দুজন লোক টের পেয়ে যাওয়ার পর প্রথমজন রাবেয়াকে ধরে ফেলল। আর দ্বিতীয়জন রাকিবকে ধরতে গেলো।

রাকিব অত সহজে কাউকে ছাড়বে না। যেই লোকটা রাকিবের দিকে ছুটে আসছিলো, তার নাকের মধ্যে একটা ঘুষি দিয়ে নাক ফাটিয়ে ফেলল। লোকটাও রাকিবকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে গিয়ে ব্যার্থ হল। রাকিব লোকটার হাত থেকে ছুড়ি কেড়ে নিল।

রাকিব রাবেয়ার কাছে দৌরে গেল। যেই লোকটা রাবেয়াকে ধরেছে, তাকেও রাকিব পেটের মধ্যে ঘুষি মারল। লোকটা যন্ত্রনায় রাবেয়াকে ছেড়ে দিয়ে ফ্লোরে বসে পরল।
আরেকজন লোক রাকিবের পেছনে এসে রাকিবের পেছনে লাঠি দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাকিব তা বুঝে ফেলে এবং পেছন দিকে ঘুড়ে তাকে আটকায়। দুজনের অনেক শক্তি মনে হচ্ছে।

রাকিব রাবেয়াকে বলল, রাবেয়া! তুমি রাফসানকে নিয়ে বাইরে চলে যাও।
রাবেয়া বুঝতে পারছে না এখন কি করবে।

রাবেয়া থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরক্ষনেই রাকিব আবার বলল, তুমি রাফসানকে নিয়ে পালিয়ে যাও। আমি এদের দেখছি। রাফসান এতোক্ষন কান্না করছিলো। রাবেয়া ওকে কোলে তুলে নিল। তারপর বাইরের দিকে পালিয়ে যেতে আরাম্ব করল। একটা লোক সেটা দেখে রাবেয়ার পিছু নিতে আরাম্ব করল। ঘড়ে রাকিব আর আরেকজনের মধ্যে লড়াই চলছে।

লোকটা একটু খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটছে। রাবেয়াকে ধরতে পারছে না। রাবেয়া পিছনের দিকে তাকাল না। এখন দুপুর। বাইরে একটা মানুষের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও রাবেয়া নিজের ছেলেকে কোলে নিয়ে দৌড়াচ্ছে। পেছনের লোকটা রাবেয়ার থেকে অনেক দূরে। ধরতে অনেক সময় লাগবে।
কিন্তু বিপত্তি বাঁধল তখন, যখন রাবেয়া একটা ছোট গর্তের মধ্যে পা ফেলতে গিয়ে

অসাবধানতাবসত ডান পা-টা মচকে যায়। উহ্ করে অর্তনাদ করে উঠে রাবেয়া। পিছনের লোকটা হয়তো রাবেয়াকে দেখতে পাচ্ছে না। তাই সে দ্রুত একটা গলির ভিতরে লুকিয়ে পরল। গলির পাশেই একটা বড় ময়লা ফেলার ঝুড়ি। তার পেছনেই লুকালো রাবেয়া।
লোকটা সেখানে এসে আর রাবেয়াকে দেখতে পারল না। তাই সে সেখান থেকে চলে গেলো। রাবেয়া যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই রাবেয়ার পা-টা ফুলে গেল। ভালোই ব্যাথা পেয়েছে পায়ে।
কোনমতে এক পায়ের উপর ভড় করে রাবেয়া সেখান থেকে বের হয়ে আসল। ব্যাথায় রাবেয়ার কান্না পাচ্ছে। এখন বাসায় কিভাবে যাবে?
রাকিবের খবর কি? আসার সময় তো রাকিব একজন লোকের সাথে লড়াই করছিলো। রাকিবের কোন ক্ষতি হলো নাতো?

কিন্তু রাবেয়া আর পারছে না। দুড়ে একটা মুদির দোকান খোলা। রাফসানকে দোকানের ব্রেঞ্চের এর পাশে বসিয়ে নিজেও একটু সময়ের জন্য বসল। দোকানটাতে কেউ নেই। শুধু দোকানদার বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

রাফসানও বুঝতে পেরেছে তার মায়ের পায়ে অনেক ব্যাথা লেগেছে। কিন্তু এই মুহুর্তে তার কি করা উচিৎ সেটা সে বুঝতে পারছে না। শুধু কাতরভাবে তার মায়ের পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে।
রাবেয়ার পায়ের ফোলা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। রাবেয়া নিজেই নিজের পা হাত দিয়ে মালিশ করছে। তখনই রাবেয়ার মনে পরে যায় পুরোনো একটা মুহুর্ত। যেদিন রাকিবের সাথে রাবেয়ার প্রথম দেখা হয়েছিল। সেদিনও রাবেয়ার ঠিক এই পা-টাই মচকে গিয়েছিলো। রাকিবকে দেখে সেদিনই রাবেয়ার মনের মধ্যে ভালোবাসার আলো জ্বলে উঠেছিল।

রাবেয়ার কল্পনার জগত থেকে হুস ফেরে দোকানদারের গলার আওয়াজ শুনে। দোকানদার এতোক্ষন ঘুমিয়েছিল। রাবেয়াকে দেখে সে বলল, কিগো.. কি চাই?
রাবেয়া অল্প স্বরে বলল, কিছুনা।
দোকানদার লোকটা রাবেয়ার পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে পায়ে?
- কিছুনা। একটু ব্যাথা পেয়েছি।
- ওহ। সেরে যাবে।
রাবেয়া আর কোন কথা বলল না। আবার নিজের পা টেপা আরাম্ব করল।
কিছুক্ষন পর রাবেয়া দোকানদার লোকটাকে বলল, আচ্ছা চাচা! আপনার ফ্রিজে কি বরফ আছে?
- হুম আছে।
- আমাকে একটু দিন না! অনেক ব্যাথা পেয়েছি। দ্রুত ব্যাথা কমাতে হবে। এখনি বাসায় যাওয়া লাগবে।
দোকানদার লোকটা ফ্রিজ খুলে কয়েকটা আইস কিউব বের করে একটা ছোট বাটির মধ্যে দিল।
রাবেয়া আস্তে করে বলল, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

আস্তে আস্তে এলাকার রাস্তায় লোকজন আসা আরাম্ব করল। দোকানে থাকাটাও রাবেয়ার জন্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তার মধ্যে রাফসানকে নিয়ে। যেভাবেই হোক তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। রাকিবের আবার কিছু হয়ে যায় নি তো?
দুপুর গড়িয়ে বিকাল হয়ে আসল। অনেকখানি পথ রাবেয়া হেঁটে গেল। তারপর একটা রিকসাওয়ালাকে অনেক অনুরোধ করে রাবেয়া বাসায় গেল।

বাসায় ঢুকে রাবেয়া তো পুরোই অবাক। বাসার দরজা এখনো খোলা। কিন্তু বাসার ভেতরে তন্ন তন্ন করে খুজেও রাকিবকে পাওয়া গেল না। রাবেয়া আগে রিকশাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে বিদায় করে দিল। তারপর বিছানায় বসে চিন্তা করতে লাগল। রাকিবের আবার কিছু হয়ে যায় নি তো?
বাসার অনেক জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছড়ানো। রাবেয়া বুঝতে পারে বদমায়েশ লোকটার সাথে রাকিবের লড়াই হয়েছে। কিন্তু এখন দুজনকেও পাওয়া যাচ্ছে না। তারা গেল কোথায়?

রাবেয়ার প্রচুর ভয় হতে লাগল। রাকিবের কিছু হয়ে গেলে দুজনের কেমন হবে? রাবেয়া এখন কি করবে? নিজেও হাঁটতে পারছে না। কোথায় গিয়ে খুঁজবে রাকিবকে?
রাবেয়া আল্লাহর কাছে কান্না করে অনুরোধ করছে, রাকিবকে তুমি সাবধানে রেখো। ওর যেন কোন কিছু না হয়।
কিছুক্ষন পর রাবেয়া বাইরে গেল। অনেককেই জিজ্ঞাস করল, দুপুরের দিকে রাকিবকে কোথাও যেতে দেখেছে কিনা? কিন্তু ওই সময়টাতে সবাই একটু বিশ্রাম করে। ফলে কেউ বিষয়টা দেখতে পায় নি। রাবেয়া কি করবে কিছুই বুঝতে পারে না। সন্ধ্যার সময় বাসায় এসে রাবেয়া রুমটা গোছায়। কয়েকটা জিনিসপাতি নিচে পরে গেছিলো। সেগুলোই মুছে তুলে রাখল উপরে।

এমন সময় একটা জিনিসের দিকে তাকাতেই রাবেয়ার চোখ সোজা কপালে উঠে যায়।
রাবেয়া দেখতে পায় তাদের সিসার মোটা কলসিটার মুখের একপাশে রক্তের দাগ। একটু না। অনেকখানি রক্ত। রাবেয়া সেটা দেখে প্রচন্ড রকমের ভয় পেয়ে গেল। পরক্ষনে সেখানেই রাবেয়া কান্না করতে আরাম্ব করে দিল আর ভাবতে লাগল, রাকিবের কি হয়েছে? রাকিব ভালো আছে তো? কলসির এই রক্তটা কার? রাকিবের নয় তো?
কথাটা ভাবতেই রাবেয়ার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। টেবিলের উপর থেকে এক গ্লাশ পানি ঢকঢক করে খেয়ে নিল। রাফসান তার আম্মাকে বলে, আব্বা কোথায় গেছে?
রাবেয়া রাফসানকে শান্তনা দিয়ে বলে, এইতো! একটু বাইরে গেছে। তুমি চিন্তা করো না বাবা। একটু পরেই এসে পরবে।

রাফসান মোটেও চিন্তা করছে না। চিন্তা করছে রাবেয়া নিজেই। এখন কোথায় খুজবে রাকিবকে? বাইরেই বা কাকে জিজ্ঞাস করবে? আর কিছুক্ষনের মধ্যেই রাতের অন্ধকার নেমে আসবে। এই সময় রাবেয়ার নিজেরও একা রাস্তায় বের হতে ভয় লাগছে। সবচেয়ে বড় কথা

রাকিব তার মোবাইল সাথে নেয় নি। মোবাইলটা বিছানার বালিশের পাশেই পরে আছে।
রাকিব কোথাও গেলে তো ফোন নিতে ভুলে না! বড্ড চিন্তা হচ্ছে রাবেয়ার। এই রাতের বেলা কোথায় গেল লোকটা?
কিছুতেই রাবেয়া ঘড়ে বসে থাকতে পারছে না। রাফসানকে বাসায় রেখে রাবেয়া বের হয়ে গেল বাসা থেকে। কিছুদিন আগে তিনজনে মিলে একটা ছবিও তুলেছিলো তারা। রাবেয়া সেই ছবিটাও সাথে করে বের হল।
কয়েকটা দোকানের লোকের কাছে রাবেয়া ছবি দেখালো। তারাও দেখে নি। কয়েকজন লোক রাকিবকে চেনে। তারাও নাকি আজকে সারাদিন কোথাও রাকিবকে দেখে নি।
আর তাছাড়া না দেখাটাই স্বাভাবিক। দুপুর বেলা অই সময়টাতে কোন লোকজন ছিল না।

সেদিন অনেক খুঁজেও রাকিবকে পাওয়া গেল না। রাবেয়া ক্লান্ত হয়ে প্রায় রাত ১২ টার দিকে বাসায় আসে। রাফসান ঘুমিয়ে গেছে। রাবেয়াও বাসায় আসার পর আর নিজের চোখকে খুলে রাখতে পারল না। বিছানায় গিয়ে রাফসানের পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেও রাবেয়া ঘুম থেকে উঠে দেখল রাকিব আসে নি। রাবেয়া আর নিজের কান্না আটকে রাখতে পারল না। বাসার মধ্যেই কান্না আরাম্ব করে দিল। রাফসান ঘুম থেকে উঠে বলল, আম্মা! আব্বা কোথায় গেছে?
রাবেয়া কান্না জড়িত কন্ঠে বলল, তোর আব্বাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছিনা রে। কোথায় গেল লোকটা? আমার অনেক চিন্তা হচ্ছে।
রাফসানের মুখেও চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তারপর রাবেয়াকে সে বলল, চলো আম্মা থানায় যাই।

সকাল ১০ টার দিকে রাফসানকে নিয়ে রাবেয়া থানায় গেল। সাথে রাকিবের ছবিটাও নিয়ে গেল।
ওসি সাহেব রাবেয়ার কাছে রাকিবের ছবিটা চাইল। তারপর আরেকজন পুলিশের হাতে ছবিটা দিয়ে বলল, এই মাসুম! কম্পিউটারের ডেটাবেসে এই লোকটাকে সার্চ করে দেখ তো। লোকটাকে কেন জানি চেনা চেনা লাগছে আমার।
মাসুম নামের লোকটা ওসি সাহেবের হাত থেকে ছবিটা নিয়ে রাকিবের ছবিটা স্ক্যান করল।
তারপর লোকটা কিছুক্ষন কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একটু পরে লোকটা কিছুটা চমকে গিয়ে বলল, স্যার এইটা তো সেই খুনের আসামী রাকিবুজ্জামান। লোকটার কথা শুনে রাবেয়াও অনেকটা চমকে গেল। লোকটা বলে কি এসব? রাকিব কিছুতেই কাউকে খুন করতে পারে না।
ওসি সাহেব রাবেয়াকে বলল, আপনি রাকিবুজ্জামানের কি হন?
রাবেয়া জবাব দিল, উনি আমার স্বামী হন।
- আপনার স্বামী তো একটা লোককে খুন করে ফেলেছে। সময় মতো পুলিশকে খবর না দিলে তো আপনার স্বামীকে পুলিশ ধরতেই পারতো না। পুলিশেরা গিয়ে দেখে এক্কেবারে রক্তারক্তি অবস্থা। সাথে সাথে জীপে তুলে সোজা থানায়। থানা থেকে এক্কেবারে জেলে।

রাবেয়া যেন কথা বলার ভাষা হাড়িয়ে ফেলেছে। রাকিব জেলে আছে এই কথা রাবেয়া মোটেও বিশ্বাস করতে পারছে না। কখন ঘটল এসব? কালকের দুপুরের অল্প কিছু সময়ের মধ্যে এতো কিছু ঘটে গেল? ওসি সাহেবের কথা শুনে রাবেয়ার নীচ থেকে যেন মাটি সরে গেল।

রাবেয়া ওসি সাহেবের কাছে অনুরোধের স্বরে বলল, আমাদের এই শহরে পরিচিত কেউ নাই। আমার এই একটা ছেলে আছে। আমার স্বামীকে ছাড়া আমি কিভাবে থাকব? আর আমার স্বামী কোনদিনই কাউকে খুন করতে পারে না। এটা আমি বিশ্বাস করি না।
- আপনার স্বামী যদি নিজের মুখেই স্বীকার করে উনি খুন করেছেন, তখন আপনি কি বলবেন?
রাবেয়া চমকে যাওয়া স্বরে বলল, উনি স্বিকার করেছে?
- হ্যা।
- আচ্ছা! আমার স্বামী কোথায় আছে এখন?
- ঢাকা কেন্দীয় কারাগারে। আজকে সকালে কোর্টে তোলা হবে। তারপর রায় দেওয়া হবে। অন্তত ৬-৭ বছরের জেল হতে পারে, আবার ফাঁসিও হতে পারে।
- রাবেয়া কথাটা শুনে আঁতকে উঠল। তারপর ওসি সাহেবকে অনুরোধ করে বলল, প্লিজ উনাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাবস্থা করুন প্লিজ।
ওসি সাহেব বললেন, এখানে আমার তো কোন হাত নেই। যা করবে, আদালত করবে। এখানে আমার কথায় তো কাজ হবে না।
রাবেয়া বলল, আমাকে ওনার সাথে একটু দেখা করার সুযোগ করে দিতে পারবেন?
- সেটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। আবেদন করতে হবে। আপনি বরং দুদিন পর আসুন। তারপর দেখা যাবে।
এই দুইটা দিন রাবেয়ার কাছে অনেক। এই নতুন জায়গায় আসার পর রাবেয়া রাকিবকে ছাড়া একটা দিনও কাঁটায় নি। এখানে কিভাবে থাকবে সে?

দুইদিন পর রাবেয়া আবার থানায় আসল। ওসি সাহেব আবেদন করেছিলেন। রাকিবের সাথে দেখা করার অনুমতি পেয়েছে।

রাবেয়া রাফসানকে নিয়ে কেরানীগঞ্জ পৌছে গেল। তারপর ঢাকা জেলখানায় গেল। রাবেয়া রাকিবের অবস্থা দেখে আর নিজের কান্না ধরে রাখতে পারল না। সেখানেই হাউমাউ করে কান্না আরাম্ব করে দিল। এই তিনটা দিনের মধ্যেই রাকিব অনেকটা শুকিয়ে গেছে। গায়ের রঙ কালো হয়ে গেছে।
রাকিব রাবেয়ার উদ্দেশ্য করে বলল, শান্ত হও রাবেয়া। যেটা হয়েছে সেটা মেনে নাও। আর আমি তো হাড়িয়ে যাই নি। আমি তো আছি। মাত্র সাতটা বছর। তারপর আবার তোমার কাছে চলে আসব।
রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে বলল, তুমি সাত বছরকে মাত্র বলছ? এতো বছর আমি তোমাকে ছাড়া কিভাবে থাকব?
রাকিবের অবস্থা দেখে রাফসানের চোখেও পানি চলে এসেছে। সে বলল, আব্বা! এখানে তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

- না গো আব্বু। এখানে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। দেখ না, আমার আশেপাশে কত্তো লোকজন? আমি তাদের সাথে গল্প করতে পারি। আবার তিন বেলা খাবার দিয়ে যায় পুলিশ আংকেলেরা। অনেক ভালো আছি আমি।
রাবেয়া এসব কথাগুলো শুনে কান্না করছে। এগুলো যে রাফসানের মন ভুলানো কথা, সেটা সে জানে।

রাবেয়া বলল, এসব কিভাবে হল?
রাকিব কিছুটা আফসোসের সাথে বলল, কি আর করার! প্রচুর রাগ হয়েছিলো জানো? কি থেকে যে কি হয়ে গেল? তুমি পালিয়ে যাওয়ার পরে তোমার দিকে একটা লোক ছুটে যায়। আরেকটা লোকের সাথে আমার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার এক সময় আমি লোকটায় মাথায় আমাদের কলসিটা দিয়ে জোরে আঘাত করি। লোকটা যে মারা যাবে, আমি সেটা কল্পনাও করতে পারি নি। মাথায় বাম পাশে আঘাত করেছিলাম। তার জন্যই হয়তো মারা গেছে।
ঘটনাটা তখনি শেষ করে ফেলতে পারতাম। কিন্তু একসময় দেখলাম, তোমার পেছনে যেই লোকটা ছুটে গিয়েছিলো, সেই লোকটা আবার ফিরে এসেছে। লোকটার পেছনে তিনজন পুলিশ। আমি তো হতবাক হয়ে গেলাম। আমার সামনে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশেরা আমাকে ঘিরে ফেলল। পুলিশদের আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা আমার কথা শুনল না। আর কেনই বা শুনবে আমার কথা? আমি তো তাদের চোখে খুনি হয়ে গেলাম।

তিনজনের চোখেই পানি। কিছুক্ষন পর একটা লোক পেছন থেকে রাবেয়াদের উদ্দেশ্য করে বলল, আপনাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। তারাতারি এখান থেকে বের হয়ে যান।
যাওয়ার সময় রাবেয়া রাকিবকে বলল, তুমি সাবধানে থেকো। আর নিজের খেয়াল রেখো।
রাকিব বলল, আমি আমার খেয়াল রাখব। সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। তবে আমার ছেলেটাকে দেখে রেখো কিন্তু।

রাবেয়া বাসায় চলে আসল। আজকে সারাদিন কান্না করল রাবেয়া। দুইজনেরই আজকে খাওয়াদাওয়া হল না। রাফসান বলল, ৭ বছরে কত দিন আম্মা? রাবেয়া বলল, অনেক দিন বাবা।
- এতো বছর বাবাকে ছাড়া থাকতে হবে আমাদের?
রাবেয়া ছেলেটার উত্তর দিতে পারল না। ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বলল, তুই চিন্তা করিস না বাবা। আমি তোর সাথে আছি না? আমরা মাঝে মাঝেই তোর বাবাকে দেখতে যাবো। গল্প করবো মাঝে মাঝে। ৭ বছর পানির মতো পার হয়ে যাবে। তুই চিন্তা করিস না।

কি আর করার? রাবেয়ার শাশুড়ি সংবাদটা জানার পর তো তার পাগল প্রায় অবস্থা। তার নিজের ছেলে যে খুনের দায়ে জেলে আছে সেটা সে মেনে নিতে পারছে না। নিজের ছেলেকে দেখার জন্য পাগল হয়ে আছে সে। রাবেয়া তাকে বুঝিয়ে বলল, রাকিব ভালো আছে, সুস্থ আছে।

কিন্তু করিমা বেগম কান্না করতে করতে বলল, ৭ টা বছর আমার ছেলেটা কিভাবে সেখানে সহ্য করবে? আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেটাকে দেখো।

রাবেয়াদের অবস্থা বলতে গেলে এখন খুব খারাপ। ঠিকমত খাওয়াদাওয়া হচ্ছে না, সারাক্ষন মনমড়া হয়ে বসে থাকা। দুই দিন ধরে তার শাশুরি এখানে এসেছে, রাকিবের সাথে একদিন সে দেখা করতে চায়।
তাই রাবেয়া একদিন সময় করে করিমা বেগমকে কে নিয়ে রাকিবের কাছে গেল। রাকিবের জেলে যাওয়ার ৬ দিন কেঁটে গেছে। করিমা বেগম তার ছেলের অবস্থা দেখে হাউমাউ করে কান্না আরাম্ব করে দিলো। এই কয়দিনের মধ্যে রাকিবের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে গেছে। চোখের নিচের কালো দাগ দেখে বোঝাই যাচ্ছে রাতে তার এইখানে ঘুম হয় না। রাকিবের হাত পায়ের কিছু কিছু জায়গায় লাল লাল দাগ। হয়তো রাতে মশায় কামড়ায়। তবুও কিছু করার উপায় নেই।

করিমা বেগম রাবেয়াকে বলে, আমার এই ছেলেটা এতো বড় হয়ে গেছে, তবুও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারত না। কিন্তু এখন আমাকে ছাড়া এখানে ৭টা বছর কিভাবে থাকবে?
রাকিব তার মাকে বলে, তুমি চিন্তা করো না তো। দেখতে দেখতেই ৭ টা বছর পার হয়ে যাবে, তুমি দেখো।
তারা অনেক্ষন আলাপ করার পর শেষমেশ রাকিব তার মাকে বিদায় জানায়। করিমা বেগম যাওয়ার সময় ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে করতে বলে, ভালো থাকিস বাবা। আর নামাজ পড়িস। তোর পাশে আল্লাহ আছে। তুই তো ইচ্ছা করে এসব করিস নি। সবার ভালোর জন্যই করেছিস। ওসব গুন্ডা বদমাইশ লোকদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

রাবেয়ারা তাদের বাসায় চলে আসল। করিমা বেগম নাকি চলে যাবে। সংসার দেখাশুনা করা, নিজের কাজ করা, আরো অনেক কাজ পড়ে আছে। তাই চলে যেতে হবে।
যাওয়ার সময় রাবেয়াকে বলল, খারাপ লাগলে আমার কাছে চলে এসো। আরেকটা অনুরোধ তোমাকে করে যাচ্ছি, আমার ছেলেটার জন্য একটু দোয়া করো। আর নিজের যত্ন নিও।

রাবেয়ার দিনকাল চলছিলো মোটামুটি। ছেলের খরচ, বাসা ভাড়া, বাজারের খরচ, আরো কত কি? কিছুদিনের মধ্যেই একটা বিশাল অর্থসংকটের মধ্যে পড়তে হয় রাবেয়াকে। যেহেতু রাকিবের আয় বন্ধ। টাকা উপার্জনের কেউ নেই। কোথায় পাবে এত্তোগুলা টাকা?

বর্তমানে রাবেয়ারা যেই বাসায় থাকে সেটার ভাড়া অনেক। এতো টাকা রাবেয়ার প্রতিমাসে দেওয়া সম্ভব না। তাই রাবেয়া, কোনমতে এই এক মাসের টাকা পরিশোধ করে বাসাটা ছেড়ে দেয়।
একটা পুরোনো কম ভাড়ার একটা বাসা ভাড়া নেয়। সেই বাসার মালিক নাকি ইংল্যান্ডে থাকে। বাসা দেখাশোনা করার জন্য একজন কর্মচারী রাখা হয়েছে। সেই কর্মচারীকেই প্রতিমাসে বেতন দিতে হবে।

দিন যত অতিবাহিত হতে থাকে রাফসান তত বড় হতে থাকে। দেখতে দেখতে আরো দুইটা বছর পার হয়ে যায়। রাফসানের বয়স এখন ৬ বছর। রাফসানকে একটা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে রাবেয়া। ক্লাশ ওয়ানে পড়ে। রাফসান ছোটবেলা থেকেই অনেক ভালো ছাত্র। এর জন্য স্কুলের বাইরে আর কোথাও টিউশনি করা লাগে না। আর রাবেয়াও একসময় অনেক ভালো ছাত্রী ছিল। অনেক সপ্ন দেখেছিলো রাবেয়া। কিন্তু সেই সপ্নগুলো হয়তো তার অপুর্ণই থেকে যাবে।
কিন্তু রাবেয়া চায়, আমি যেই সপ্ন বাস্তবায়ন করতে পারি নি, সেটা রাফসান করে দেখাবে।

রাফসান সকাল বেলা খেয়েদেয়ে স্কুলে যায়। আর রাবেয়া চলে যায় কাজে। গত এক বছর ধরে রাবেয়া একটা বাসায় কাজ করে। বাসায় শুধু দুইজন বুড়োবুড়ি। তাদের রান্না করা বা কাপড় ধোয়ার কেউ নেই। তার ছেলেরাও নাকি বিদেশে আছে। সেখানেই বিয়ে করে সেটেল তারা। তবে ছেলেরা মাসে মাসে মোটা অংকের টাকা পাঠায়।

রাবেয়ারও বলতে গেলে বেশি কাজ নেই, সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা রান্না করে ফ্রিজে রেখে আসা। আর সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন কয়েকটা কাপড় ধোয়া।
এই বেতন দিয়েই রাবেয়ার কোনরকম সংসার চলতে থাকে। তবে এভাবে আর কতদিন?
ছেলে বড় হচ্ছে। খরচপাতি ক্রমশ বাড়ছে। রাবেয়া নিজেও অনেকদিন ধরে নিজের জন্য একটা কাপড় কিনতে পারে না। দোকানে গেলেই চিন্তা হয়, মাসের শেষের দিকে বাজারের পয়সা হবে কি?

রাফসানের লেখাপড়ার খরচটাও চালাতে হয়। দুপুরবেলা রাবেয়া বাসায় থাকে না। রাফসানকে টিফিনের টাকা দেওয়া লাগে প্রতিদিন। আবার কিছুদিন ধরে নাকি স্কুল ড্রেসটাও পুরোনো হয়ে গেছে। আরেকটা নতুন বানাতে হবে।
দুই বছর ধরে রাকিব জেলে আছে। রাবেয়া থানায় গিয়ে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছে রাকিবকে ছাড়ানোর কোন একটা ব্যাবস্থা করার। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। সব প্রমাণ রাকিবের বিপক্ষে। চেষ্টার কোন বাদ রাখেনি রাবেয়া। একবার এক মন্ত্রীর কাছেও গিয়েছিল। সেও নাকি এসব খুনের আসামীকে ছাড়াতে ব্যার্থ।

এই কিছুদিন ধরে সব চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে রাবেয়া। রাকিবের চিন্তায় রাবেয়াও ক্রমশ অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। সেদিন সে রাকিবের কাছে গিয়েছিল। রাকিব বলল, কি লাভ অযথা চেষ্টা করে। তার চেয়ে তুমি আমার ছেলেটাকে দেখে রাখ। দেখতে দেখতে দুইটা বছর তো চোখের পলকেই পার হয়ে গেল। আর তো মাত্র ৫ বছর। তার পরেই আমি তোমার কাছে ফিরে আসব।
রাবেয়া কান্না করতে করতে বলে, তোমার চেহারা দেখে আমার সহ্য হয় না। আগে কত সুন্দর ছিলে। এখন কেমন হয়ে গেছ। কতো শুকিয়ে গেছ তুমি। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া হয় না এখানে। তোমাকে এভাবে কষ্টে রেখে আমি নিজে কিভাবে শান্তিতে থাকব, বলো?

দুজনের চোখেই পানি। রাকিব বলে, তুমিও আগের চেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছ। নিজের শরিরের যত্ন নাও। ভালো থেকো।
রাবেয়ার চোখে পানি টলমল করছে। রাকিবের কিছু হয়ে যাবে না তো?

বেশ কয়েকদিন ধরে রাবেয়ারও কোন কাজে মনোযোগ নেই। সেদিন রান্না করতে গিয়ে কখন নিজের হাত পুড়িয়ে ফেলেছে তা খেয়ালই করে নি। যখন রাবেয়া হাতের দিকে তাকাল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাতে বড় একটা ফোঁড়া উঠে গেল সাথে সাথে। জায়গাটা লাল হয়ে গেল।
রাফসানের লেখাপড়াতেও রাবেয়া কেমন জানি অমনোযোগী হয়ে গেছে।
সেদিন রাফসান স্কুল থেকে এসে মন খারাপ করে বসে রইল। রাবেয়া কাছে গিয়ে বলল, কি হয়েছে?
রাফসান বলল, আমাকে একটা নতুন স্কুল ড্রেস বানিয়ে দিবে কবে? আমার স্কুলের সব বন্ধুরা ভালো ভালো চকচকে ড্রেস পড়ে স্কুলে যায়। আর আমার ড্রেসটা দিন দিন কেমন হলদে হয়ে যাচ্ছে। সব ছেলেরা আমার ড্রেসের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার অনেক লজ্জা লাগে খুব। আজকে আবার স্কুলের মিস আমাকে বলেছে, কালকে একটা নতুন ড্রেস পড়ে আসবে। সবার মাঝে তোমাকে কেমন বেমানান দেখা যায়।

রাবেয়া হালকা গলায় বলল, আচ্ছা। তোকে নিয়ে দর্জির কাছে যাবো। রেডি থাকিস।
- আজকে দিয়ে এই নিয়ে তুমি কথাটা ৫ বার বললে। কিন্তু একবারো নিয়ে যাও নি।

রাফসানের কথা শুনে রাবেয়ার চোখ কপালে উঠল। রাবেয়া আসলেই ৫ বারের মতো রাফসানকে এই কথাটা বলেছে। রাফসান সেটা মনে রেখেছে।
রাবেয়া এইবার বলল, টাকাপয়সা নিয়ে খুব ঝামেলায় আছি রে। আর দুই দিন পর বাড়িভাড়া চাইতে আসবে। তারমধ্যে বাজারের কিছু নেই। বাজার করতে হবে। আমার টাকা পেতে পেতে কম্পক্ষে আরো এক সপ্তাহ দেরি হবে। এই সপ্তাহটা কেমনে কাঁটাবো সেটা নিয়ে চিন্তা করছি। তোকে বরং এইবার টাকাটা পেয়েই একটা ড্রেস বানিয়ে দিবো।
- তোমার টাকা পেতে লাগবে সাত দিন। ড্রেস বানাতে লাগবে আরো সাত দিন। মোট হল চৌদ্দ দিন। এই চৌদ্দ দিন কি আমি এই পচা ড্রেস পড়ে স্কুলে যাবো?
- একটু কষ্ট করে মানিয়ে নে বাবা। আজকে তোর বাবা বাসায় থাকলে আমাদের এমন দিন দেখতে হত না।
- আমি অত কিছু বুঝিনা। যতদিন আমাকে স্কুল ড্রেস না বানিয়ে দিচ্ছো ততদিন আমি স্কুলে যাচ্ছি না।
এই কথাটা বলে রাফসান ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না করতে করতে রাবেয়ার সামনে থেকে চলে গেল।

রাবেয়া জানে, তার ছেলেটা অনেক কষ্ট পেয়েছে। হয়তো স্কুলে বন্ধুদের মুখ থেকে ড্রেসের জন্য বাজে কথা শুনতে হয়েছে। তার জন্যই ছেলেটা রাগ করে বসে আছে। কিন্তু কি আর

করার? একটা ড্রেস বানানোর খরচ অনেক। মাসের শেষের দিকে এতো টাকা খরচ করতে ভয় লাগে তার।
আর তাছাড়া রাফসান স্কুলে না যেতে চাইলে না যাক। তাতেও রাবেয়ার কোন আফসোস নেই। ইচ্ছা হলে যাবে, ইচ্ছা হলে যাবে না।

এই মাসের টাকাটা পেয়েই রাবেয়া রাফসানকে নিয়ে দর্জির কাছে গেল। আজকে ছেলেটা অনেক খুশি। রাবেয়া বলল, আমি টাকা খরচ করে স্কুল ড্রেস বানিয়ে দেব আর তুই বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করে ড্রেসে ময়লা লাগিয়ে আনবি, সেটা হবে না। একটা কথা মনে রাখবি, আগামী ২ বছর আর কোন ড্রেস পাবি না। এটাই খুব সাবধানে ব্যাবহার করবি।
রাফসান মাথা ঝাকিয়ে হ্যা বোধক উত্তর দিলো। মনে হচ্ছে সে তার মায়ের কাছে এরকম আদেশ আশা করে নি।

সেদিন রাফসান স্কুল থেকে এসে রাবেয়াকে বলছে, আজকে একটা কাজ করেছি।
- কি কাজ?
- আমার স্কুলে ৬-৭ জনের মতো বন্ধু ছিলো।
- তো?
- আমি চিন্তা করেছি, বন্ধু ছাটাই করে ফেলব।
- কেন রে?
- ছেলেগুলা কেমন যানি। সারাক্ষন খালি কি সব আলাপ করে।
- কিসের আলাপ করে?
- ওদের আব্বাদের নাকি অনেক টাকাপয়সা। আর দুই বছর পর নাকি তাদের বাবারা তাদের একটা করে মোবাইল কিনে দিবে।
- তো কি হয়েছে?
- আমার শুধু শুনতে হয় ওগুলা আলাপ, কিছু বলতে পারি না, চুপ করে থাকতে হয়।
- তোর যা ইচ্ছা কর।

রাফসান স্কুলে চলে গেলে রাবেয়া মাঝে মাঝে মন খুলে কান্না করে। কান্না করলে তার মনটা আগের থেকে অনেক হালকা হয়। কেন কান্না আসে সেটা রাবেয়া এখনো বুঝে উঠতে পারে নি। কান্নার হয়তো অনেকগুলা কারণ আছে। তবে রাবেয়া বুঝতে পারে, তার দুনিয়াটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে। একসময় নিজেকে ঠাই দেওয়ার জায়গাটাও হয়তো সে পাবে না।
কাজে গেলেও রাবেয়া অমনোযোগী। হাতের পোড়ার দাগ কমতে না কমতেই আজকে আবার বটিতে হাত কেঁটে গেল। অনেকটুকু রক্ত বের হয়ে গেল। বাসায় মালকিন ছিলো বলে রক্ষা। সে এসে রাবেয়ার হাতে অসুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলো আর বলল, একটু সাবধানে কাজ করতে পারো না? কিছুদিন ধরে তোমাকে বড্ড বেখেয়ালি দেখাচ্ছে। সমস্যা কি তোমার?
- এইতো। সব ঠিক আছে। কিছুই হয় নি। একটু মাথা ব্যাথা করছিলো তো।
- আচ্ছা। আর যেন এরকম না হয়।

কিন্তু এরকম ঘটনা আরো ঘটল। তারপরের দিন রাবেয়া টেবিল মুছতে গিয়ে অসতর্কতা বসত দুইটা কাঁচের গ্লাস ভেঙে ফেলল। গ্লাশদুইটা ফ্লোরে পড়ার সাথে সাথেই টুকরা টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। মালকিন এটা দেখার পর তো রাবেয়াকে যাচ্ছেতাই বকুনি।
- এই মেয়ে? দুইটা গ্লাশের দাম জানো? ধপাস করে মেঝেতে ফেলে যে ভেঙে ফেললে। এর দাম কে দিবে? তোমার মতো ফকিরের দেওয়ার মুরোদ হবে? আমার ভুল হয়েছে তোমার মতো মেয়েকে আমার বাড়িতে রেখে। তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাসা থেকে বের করে দেওয়া উচিত আমার।

কথাগুলো রাবেয়ার অন্তরে তীরের ফলার মত বিঁধে গেল। যেন আর সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু কিছু করার নেই।
এমন সময় বাসার মালিক ঘড়ে আসল। এসে এই অবস্থা দেখে তার স্ত্রীকে বলল, থাক না। সামান্য দুইটা গ্লাসই তো। ক্ষমা করে দাও।

লোকটা রাবেয়ার কাছে গিয়ে বলল, দিন দিন তুমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে যাচ্ছো। আমার মনে হয় তোমার কিছুদিন বিশ্রাম করার দরকার।
রাবেয়া হালকা গলায় বলল, নাহ্! সেটার কোন প্রয়োজন নেই। কিছুদিন ধরে ঘুমটা একটু কম হচ্ছে তো। তাই মাঝে মাঝে মাথা ঘুড়ায়। তবে সত্যি বলছি, আর এরকম ভুল কখনো হবে না।
- আচ্ছা ঠিক আছে। কোনরকম কাজটাজ করে বাড়ি চলে যেও।

সেদিন থেকে রাবেয়া চিন্তা কমানোর অনেক চেষ্টা করেছে। ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কোনভাবেই খেতে ইচ্ছা করে না। অনেকটা জোড় করে খায়।
ছেলেটারও ঠিকমতো খেয়াল রাখতে পারছে না সে। স্কুলের পড়ার খবরটাও নিতে ইচ্ছা করে না। রাফসান নিজে নিজেই নিজের পড়া তৈরি করে।
রাফসান মাঝে মাঝেই তার মাকে বলে, তোমার শরির দিন দিন কেমন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। একটা ভালো ডাক্তার দেখাতে পারো না? জানো.. আমার একটু ফ্রেন্ডের আব্বু নাকি ডাক্তার।
- তুই না সেদিন বললি, তোর কোন বন্ধু রাখতে চাস না। সবার সাথে নাকি কাট্টি করে দিবি?
- চেয়েছিলাম তো। কিন্তু হলো কোথায়? কোন দরকারে বন্ধুদের কাছে সাহাজ্য চাওয়াই লাগে।
- হুম। ভালো বন্ধুগুলাকে ছাড়িস না।
- সেটা নাহয় বুঝলাম কিন্তু আমার কথার জবাব দাও। একটা ডাক্তার দেখাবে না?
- ডাক্তারকে দেখালেও টাকা লাগে। অসুধের দাম জানিস?

রাবেয়ার শরিরের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। সেদিন রাবেয়া বাসায় গিয়ে কাজ করার সময় হটাৎ অজ্ঞান হয়ে গেল। আচমকা এমনটা হওয়াতে বাসার দুজনেই হতবাক। রাবেয়ার মাথায় পানি দিয়ে কোনরকম হুস ফিরিয়ে রাবেয়াকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল। আর রাবেয়াকে বলে দেওয়া হল, তুমি রেষ্ট নাও। তোমার আর কাজে আসতে হবে না। আমরা অন্য কাউকে কাজের জন্য রেখে নেব।
রাবেয়ার হাতে ১০ দিনের বেতনের টাকা তুলে দিয়ে বিদায় করে দেওয়া হল।

রাবেয়ার একুল ওকুল দুকুলই যেন হাড়িয়ে ফেলল। এখন এই সামান্য টাকায় সংসার চলবে কেমনে? কাজটার খুব দরকার ছিলো। আর এই অসুস্থ অবস্থায় রাবেয়াকে কে কাজ দেবে?
বাসায় গিয়ে রাবেয়া অনেক্ষন কান্না করল। রাফসান স্কুলে গিয়েছে। মন খুলে কান্না করতে আর কোন বাঁধা নেই।

রাবেয়ার শরিরটা আজকে কেন যানি অনেক খারাপ লাগছে। বিছানায় শুয়ে কখন ঘুমিয়ে গেছে সেটা রাবেয়া খেয়ালই করে নি। তার ঘুম ভাংল রাফসানের ডাক শুনে। কিন্তু রাবেয়ার কেন যানি উঠতে ইচ্ছা করছে না। রাফসান কিছুক্ষন ডাকার পর আর ডাকল না। বাইরে হয়তো কোথায় চলে গেল। রাবেয়া ঠিক আগের মতোই শুয়ে রইল।
কতক্ষন সময় পার হয়েছে সেটাও তার খেয়াল নাই। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা আলো। সন্ধ্যে কি হয়ে এসেছে? কোথাও তো মাগরিবের আযান শুনা যাচ্ছে না। নাকি আযান অনেক আগেই হয়ে গেছে? রাফসান কোথায়?

রাবেয়া উঠতে গেলেই তার মাথাটা হঠাৎ কেমন যানি চক্কর দিয়ে উঠল। আবার ধপাস করে শুয়ে পরল রাবেয়া। আস্তে করে সে রাফসানকে একবার ডাকল।

রাফসান মনে হয় পাশেই ছিলো। সাথে সাথেই তার মায়ের ডাকে সারা দিয়ে সে বলল, তোমার কি হয়েছে আম্মু?
রাবেয়া বলল, বড্ড খারাপ লাগছে রে আমার। আমার মাথায় একটু পানি দেনা।
রাফসান রাবেয়ার কপালে হাত দিয়ে দেখল কপালটা অনেক গরম। রাফসান চমকে গিয়ে বলল, আম্মু। তোমার তো অনেক জ্বর। এখন কেমন হবে?

রাফসান জলদি করে একটা বালটির মধ্যে পানি এনে একটা গ্লাস দিয়ে রাবেয়ার মাথায় ঢালতে লাগল। এখন কিছুটা ভালো লাগছে রাবেয়ার। রাফসান বলল, তোমাকে কতবার বলি, একটা ডাক্তার দেখাও। তুমি আমার কথা শুনো না। এখন জ্বর আনিয়ে ফেললে। এখন কেমন লাগছে?
রাবেয়া চুপ করে রইলো। কোন কথা খুজে পেল না।
রাফসান আবার বলল, কালকে সকালেই আমার বন্ধুর বাবাকে এখানে নিয়ে আসবো দেখো।

পরদিন সকালে রাবেয়া অল্প কয়েকটা রান্না করে ছেলেকে খায়িয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিলো। নিজেও কিছু খেল। কালকে সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়েছিলো না। প্রচুর খেতে ইচ্ছে করছিলো ঠিকই কিন্তু, খাবার মুখে দিয়ে বুঝতে পারে খাবারের স্বাদ অনেক তেঁতো। সম্ভবত জ্বরের কারণে। তবুও কয়েকটা ভাত খেল।
রাবেয়া ভাবল, একটা ডাক্তার দেখানো দরকার। কিন্তু এখন এই শরির নিয়ে হাটতে পারছে না সে। কোনভাবেই যাওয়া সম্ভব নয়। রাফসান বলেছিলো, তার বন্ধুর বাবা নাকি বড় ডাক্তার। স্কুল থেকে ফেরার সময় তার বন্ধুর বাবাকে নাকি নিয়ে আসবে।
সত্যিই কি আনতে পারবে? ডাক্তারেরা বড় লোক। তারা কি তাদের মতো গরিরের ঘড়ে আসতে

চাইবে? হয়তো আসবে না।

বিকালবেলা রাবেয়াকে অবাক করে দিয়ে রাফসান ঘড়ে ঢুকল। রাবেয়া দেখল রাফসানের পেছনে আরেকজন লোক। রাবেয়া কিছুক্ষন সেদিকে হা করে তাকিয়ে রইল। ইনিই কি তাহলে সেই ডাক্তার? রাফসান সকালে যার কথা বলেছিলো?

রাফসান লোকটাকে ঘড়ে আসার জন্য অনুরোধ করল। লোকটা ঘড়ে আসল। তার হাতে একটা কালো রঙের ব্যাগ। এমনিতে একটা ফুলহাতা শার্ট আর একটা কালো প্যান্ট। বয়স বেশি না।
রাফসান সব কথা লোকটাকে খুলে বলল। ব্যাগ থেকে স্টেথোস্কোপটা বের করে রাবেয়াকে দেখতে আরাম্ব করল।
ডাক্তার লোকটা বলল, কতদিন ধরে জ্বর আপনার?
রাবেয়া আস্তে করে বলল, গতকাল থেকেই জ্বর।
- মনে হচ্ছে আপনি খুব টেনশনে থাকেন। খাওয়াদাওয়াটাও নিয়মিত করছেন না। শরিরে তো রক্ত নেই বললেই চলে। এভাবে চলতে থাকতে তো...

লোকটা কথাটা আর বলতে পারল না। কিন্তু কথাটার পরবর্তী অংশ কি হতে পারে? এভাবে চলতে থাকলে কি সে মরে যাবে? বাঁচানো যাবে না?
ডাক্তার লোকটা আবার বলল, এই কয়েকদিন আপনাকে একটু বেশিই খাওয়াদাওয়া করতে হবে। নিয়মিত ফলমূল খেতে হবে। রক্তের পরিমান বাড়াতে হবে। আর আমি কিছু অসুধ লিখে দিচ্ছি সেগুলা খেতে পারলে আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন আশা করা যায়। আর জ্বরের জন্য চিন্তা করবেন না। জ্বর তো এমনিতেই সেরে যাবে। তবুও একটা অসুধ লিখে দেই।

সে একটা নোট প্যাড বের করে প্রেসক্রিপশন করে সেই কাগজটা রাফসানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এই অসুধগুলো তোমার আম্মাকে নিয়মিত খাওয়াবে। এগুলা অই পাশের ফার্মেসির দোকানেই পাওয়া যাবে। সেখান থেকে নিয়ে নিও।

অসুধের লিস্ট-টা অনেক বড় মনে হচ্ছে। রাবেয়ার মুখে চিন্তার ছাপ দেখা গেল। ফার্মেসিতে অসুধের যে দাম। তার কেনার সামর্থ হবে না। ইমাম সাহেবরা তো বলে, অসুধের কোন ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যদি চান, তিনি সুস্থ হবেন। অসুধ কেনার টাকা কই?
ডাক্তার সাহেব চলে যাবেন। যাওয়ার সময় রাফসানকে বলল, চলো! আমাকে এগিয়ে দিয়েসো। রাফসান তার বন্ধুর বাবাকে এগিয়ে দিতে গেল।

- তো লেখাপড়ার অবস্থা কেমন?
ডাক্তার সাহেবের কথায় রাফসান বলল, এইতো মোটামুটি।
- তা.. বড় হয়ে তোমার কী হওয়ার আশা আছে?

- আপনার মতো ডাক্তার হতে চাই। আর আপনার মতো ভালো মানুষ হতে চাই।
ডাক্তার সাহেব কিছুক্ষন হাসল। তারপর বলল, আমি কী ভালো মানুষ?
- হ্যা। আপনি আসলেই অনেক ভালো মানুষ। আমার মায়ের কথা বলা মাত্রই আপনি চলে আসলেন। অন্য কোন ডাক্তার হলে আসতো না।
- শোন ছেলে... ডাক্তার হওয়ার জন্য প্রথম শর্তই হচ্ছে তোমাকে একজন ভালো মানুষ হতে হবে। অনেক ধৈর্য লাগবে। লোকেদের অনুভুতি বুঝতে হবে। একজন ডাক্তার যদি খারাপ হয়, সেটা সাধারন মানুষের জন্য আশির্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে।

ডাক্তার সাহেবের কথাগুলো রাফসান হাঁ করে শুনছিলো। ডাক্তার সাহেব একটা ফার্মেসির নিকট এসে পৌছালেন। রাফসানের হাতে থাকা প্রেসক্রিপশনটা দোকানদারকে দিয়ে বলল, অসুধগুলা দিয়ে দিন।
রাফসান একবার বলল, আমার কাছে কোন টাকা নেই। ডাক্তার সাহেব মুচকি হেঁসে বলল, তোমার কাছে কে টাকা চেয়েছে?

রাবেয়া শুয়ে ছিল। রাফসান ঘড়ে আসল। তার হাতে এক প্যাকেট অসুধ। রাবেয়া বলল, অসুধ কিভাবে আনলি? তুই টাকা পেলি কোথায়?
- ডাক্তার আংকেল কিনে দিলো।
- না করলি না?
- করেছিলাম। কিন্তু শুনলো না আমার কথা। জোর করে কিনে দিলো। অসুধগুলা নিয়মিত খেতে বলেছে। এখন খেয়ে নাও।
- দিন দিন বড্ড পাজি হয়ে যাচ্ছিস।
- হ্যা। কিছু খেয়ে নাও। খেয়ে অসুধগুলা খাবে। আর আমার বন্ধুর আব্বু অনেক ভালো। বুঝেছ? আর সব ডাক্তাররাই ভালো হয়। ভালো না হলে তারা আশির্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়।
রাবেয়ার হঠাৎ করে একটা কথা মনে পরে গেল। রাজিয়ার স্বামীও তো একজন বড় ডাক্তার। সেদিন রাতের বেলা রাজিয়ার সাথে তার স্বামীর কথাগুলো মনে পরে গেল খুব।
আসলে সেখানে তার কোন দোষ ছিলো না। রাবেয়ার নিজেরই তো ভুল ছিলো। তার ঠিক হয় নি অন্য কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে চলা।
রাবেয়ার চোখে পানি দেখে রাফসান বলল, কী হলো আবার মা?
- কিছুনা রে। কয়েকটা কথা মনে পরে গেছিলো?
- কিসের কথা?
- এমনি। তোর বাবার কথা মনে পরছে অনেক।
- আমারো। আচ্ছা। বাবা আর কতদিন পরে আসবে?
- একদিন চলে আসবে। এসে আমাদের সাথে সময় কাঁটাবে। তোকে নিয়ে ঘুড়তে যাবে।
রাফসান খেয়াল করল তার মা একটু হাঁসল। সে তার মাকে জরিয়ে ধরে বলল, তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা। আসো। কিছু খেয়ে নাও।

রাবেয়া খেয়ে অসুধ খেয়ে নিল। রাতের দিকে জ্বরটা একটু কমল রাবেয়ার। এখন অনেকটাই

ভালো লাগছে। অসুস্থ থাকার পরে কোন মানুষ যখন একটু সুস্থ হয়, তখন নিজেকে দুনিয়ার সবচাইতে সুখী মানুষ মনে হয়।
রাফসান পড়তে বসেছে। রাবেয়া আজকে রাফসানের পাশে গিয়ে বসল। বাংলা বইটা হাতে নিল। উল্টেপাল্টে দেখল। আর বলল, ইস! বইটা অনেক পালটে গেছে। আমাদের সময় তো এমনটা ছিলো না। বাংলা ম্যাডাম তোদের কেমন পড়ায়?
- অনেক সুন্দর পড়ায়।
- যেগুলা পড়ায় অগুলা বুঝিস?
- হুম। অনেক ভালো বুঝি।
সে রাতে মা-ছেলে অনেক্ষন যাবৎ গল্প করল। গল্প করার পরে ঘুমিয়ে পরল দুজনে। মায়ের শরির এখনো গরম। এতো তারাতারিই জ্বর কমবে না। অসুধ খেতে হবে। দু-একদিন পরে আস্তে আস্তে কমবে।

সকালে উঠে রান্না করতে গেল রাবেয়া। চাউল আছে। ভাত রান্না করা যাবে। কিন্তু ঘড়ে তরকারি কিছুই নাই। রাফসানকে কী খিলিয়ে স্কুলে পাঠানো যায়, সেটা ভাবতে ভাবতেই বেলা বেড়ে যাচ্ছে। ভাতটা চুলায় চড়িয়ে দিলো সে। বাকিটা আল্লাহ্ ভরসা। রাফসান উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ব্যাগ গোছাল। তারপর মায়ের কাছে কিছু খেতে চাইল। রাবেয়া ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাত তো রান্না হয়েছে। কিন্তু খাবি কী দিয়ে?
চিন্তায় রাবেয়ার মুখ একদম চুপসে গেছে। ঘড়ে একদম বাজার নাই। ১০ দিনের পাওয়া বেতনের কিছু টাকা আছে। সেটাই একমাত্র সম্বল। সেটা খরচ করলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে তারা।
রাবেয়া যখন ছোট ছিল। তখনকার একটা ঘটনা মনে পরল। ছোটবেলায় রাবেয়ার একবার ভয়ানক জ্বর হয়েছিল। জ্বরের ঠেলায় কিছুই খেতে পারছিলো না সে। মুখটা এক্কেবারে তিতা হয়ে গিয়েছিলো। যা মুখে দিচ্ছে, সব তিতা। তখন তার মা জামিলা শুকনা ভাতের মধ্যে লবন দিয়ে সাথে হলুদ দিয়ে চিনি দিয়ে মাখিয়ে দিয়েছিলো। সেই জিনিসটাই কেবল রাবেয়া খেতে পেরেছিল।

রাবেয়া গরম ভাতের মধ্যে লবন দিল, হলুদ দিল, সাথে চিনি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে রাফসানের সামনে দিয়ে বলল, খেয়ে দেখ, কেমন লাগে।
.....

দুই দিন হয়ে এলো। ঘড়ে চাউলের পরিমানটাও আস্তে আস্তে কমে আসছে। এদিকে রাবেয়ার জ্বরটা কমতেই চাচ্ছে না। রাতের দিকে একটু কমে। সকালের দিকে আবার জ্বর আসে।
কিছুদিন ধরে রাবেয়া খেয়াল করছে, রাফসান দেরি করে স্কুল থেকে আসছে। অনেক দেরি। স্কুল ছুটি হয় দুপুর বারোটায়। কিন্তু রাফসান আসে বিকাল পাঁচটায়। রাবেয়া একদিন ছেলেকে বলল, এতো দেরি করে স্কুল থেকে আসার কারণ কী? অনেক দিন ধরেই দেখছি দেরি করে আসছিস। বন্ধুদের সাথে থাকিস?
- হুম।

- কাদের সাথে?
- আমাদের স্কুলে একটা ছেলে আছে। অনেক ভালো ছাত্র। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অই ছেলেটার বাবা মারা গেছে অনেক বছর আগে। আবার মায়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে। দাদির কাছে থাকে। কিন্তু দাদিও নাকি অনেক অসুস্থ। ছেলেটা পাশের এলাকার একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। ভালোই পয়সা পায়।
- তো সেকথা আমাকে বলছিস কেন?
- আমিও যাই দুদিন ধরে। দোকানদার মামা আমাকে আজকে চা বানানো শেখাচ্ছে। আমিও কাজ করবো।
কথাটা শুনে রাবেয়া থ হয়ে রইল। কী বলছে এসব ছেলেটা? ছেলে নাকি এখন চায়ের দোকানে যায়। চা বানাবে। রাবেয়ার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হচ্ছে না। পড়ালেখা বাদ দিয়ে চা বানানো শিখছে? ছেলেকে এখন শাসন করবে নাকি উপদেশ দিবে, কিছুই ভেবে পাচ্ছে না রাবেয়া।

রাবেয়ার চোখ দিয়ে টলমল করে পানি চলে আসে। ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে একটা ঝাকি দিয়ে বলে, তুই পাগল হচ্ছিস দিন দিন? এটা কী তোর কাজ করার বয়স? তোদের বাকি বন্ধুদের দেখিস না, ওরা বিকেল বেলায় খেলতে বের হয়? আর তুই যাচ্ছিস চায়ের দোকানে কাজ করতে। বড় হয়ে কী হবি? চাওয়ালা?
- প্রতিদিন শুকনা ভাত খেতে ভাল্লাগে না আমার মা।
রাবেয়া ছেলেকে শক্ত করে জরিয়ে ধরে বলল, বড্ড ভূল হয়ে গেছে রে বাবা। ছোটবেলা থেকে তোকে ঠিকভাবে কোন কিছু দিতে পারি নি। তুই আমাদের মাফ করে দিস। আজকে তোর বাবা জেল-এ না থাকলে আমাদের এতো কষ্ট করতে হত না। আর আমি একটু সুস্থ হলেই আবার নতুন করে কাজ খুঁজে নেব।

পরদিন রাফসান স্কুলে গেল। স্কুলে রাফসানের ভালো একটা বন্ধু আছে। নাম তারেক। বাবা মারা গেছে। দাদির কাছে মানুষ হয়েছে। যথারীতি বারোটার সময় স্কুল ছুটি হল রাফসানদের। কিন্তু রাফসান এখন এই সময় বাড়ি যায় না। সে এখন একটা জায়গায় যাবে। তার সাথে তারেক নামের ছেলেটা। ছেলেটা দেখতে কালো কুচকুচে। পেছনে স্কুলের ব্যাগ।
বাইরে প্রচুর রোদ। সেই রোদ ভেদ করে দুইজন একটা গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। সামনে অনেক ধুলো। দুপুরের রোদ মাথায় লেগে মাথাটা গরম হয়ে গেছে দুজনের। আরো অনেকখানি পথ যেতে হবে তাদের। মসজিদে যোহরের আজান হচ্ছে। একটা বেজে গেছে।
আরো কিছুক্ষন হাঁটার পর তারা পৌছে গেল একটা বড় ইটভাটার সামনে। এখানেই কাজ করে তারেক। এবং গত পাঁচ-ছয় দিন ধরে এখানেই ইট বানায় রাফসান। ছাঁচের মধ্যে কাঁদা ঢেলে চাপ দিয়ে ইট তৈরি করতে হয়। বাচ্চা মানুষ। বেশি টাকা পায় না। দিনে একশো টাকা করে পায়। সেই টাকা রাফসান জমাচ্ছে। চার দিন কাজ করেছে সে। চারশো টাকা।
রাফসান গতকাল তার মাকে মিথ্যা বলেছিলো। সে কোন চায়ের দোকানে কাজ করে না। চায়ের দোকানের পয়সা খুব সামান্য। তার চাইতে এখানে অনেক বেশি টাকা পাওয়া যায়।
আর রাফসানের মতো অনেক ছেলেরাও এখান কাজ করে। অইযে দূরে রাফসান দেখতে পায়, একটা শ্যামলা মেয়ে ইট মাথায় নিয়েছে। মেয়েটা তার চাইতে বয়সে বড় হবে অনেক।

স্কুল ড্রেসে সে কাঁদা ভরায় না। তারেকের একটা পুরোনো জামা গায়ে দিয়ে সে কাজ করে। মা বলেছিলো, স্কুল ড্রেস নষ্ট হলে এইবার সে আর স্কুল ড্রেস পাবে না।
ইট বানাতে বানাতে বিকাল হয়ে যায়। আসরের আজানের সময় কাজ শেষ করে। দুজনে ভাটার ক্যাশিয়ারের থেকে টাকা আনতে যায়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে স্কুল ড্রেস গায়ে দিয়ে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বাড়িতে চলে যায়।

অনেকদিন পরে রাবেয়া তার ছেলেকে নিয়ে বাজারে গেল। মুরগী কিনল। মাছ কিনল। সাথে সবজি। রাফসান আজকে অনেক খুশি। কত দিন আগে যে মাংস খেয়েছিল তার কোন হিসাব নেই। বাসায় এসে রান্না করল রাবেয়া। রাবেয়া এখন মোটামুটি সুস্থ। তবে জ্বরটা এসে শরিরটা দুর্বল করে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই মাথা ঘুড়ায়। কাজ করতে গিয়ে বসে পরে।
অনেকদিন পর রাফসান তৃপ্তি সহকারে খেল। খেয়েদেয়ে আগামীকালকের পড়াগুলো শিখে নিল। তারপর ঘুমিয়ে পরল। এই কয়দিনে রাফসান ইট ভাটার কাজটা অনেক ভালোভাবে শিখে গেছে। মালিক কাজ দেখে খুশি হয়। মাঝে মাঝে কিছু টাকা বখশিশও দেয়।

অনেকদিন হয়ে গেল, রাকিবের সাথে কথা বলা হয় না। লোকটা মনে হয় পরিবারের কথা অনেক মনে করছে। রাবেয়া ভাবল, আবার আরেকদিন যাওয়া দরকার। গিয়ে বলা দরকার, তোমার ছেলেটা বড্ড পেঁকে গেছে। এই বয়সেই কাজ করে। লেখাপড়ায় গোল্লায় যাবে বড় হয়ে। তুমি তারাতারি বের হয়ে তোমার ছেলেটাকে উদ্বার করো।
মনে মনে অনেক কথা ভেবে রাখল রাবেয়া। এগুলো সে সেখানে গিয়ে বলবে। জেলখানায় অতো ভাবার সময়ই পাওয়া যায় না। তার আগে বলে, চলে যান এখান থেকে, সময় শেষ।

প্রায় দুই মাস পরে রাবেয়া দেখা করতে গেল রাকিবের সাথে। সাথে রাফসানও ছিল। রাকিব তাদের দুজনকে দেখে প্রচুর খুশি। সে ছেলের দিকে তাকিয়ে অবাক। এই দুই মাসে রাফসানের গঠন অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।
রাকিব রাবেয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, কী ব্যাপার? আগের চাইতে অনেক শুকিয়ে গেছ দেখছি। তোমাকে তো কতবার বলেছি, আমাকে নিয়ে তোমার কোন ধরনের চিন্তা করতে হবে না। সব চিন্তা বাদ দিয়ে তুমি শুধু তোমার ছেলেটাকে দেখে রাখবে। তাও শোনো না আমার কথা।
রাকিবের কথা শুনে রাবেয়া কোন উত্তর দিল না। চুপ করে রইল। রাফসান তার বাবাকে বলল, তুমিও তো অনেক শুকিয়ে গেছ বাবা। তুমিও বুঝি আমাদের জন্য অনেক চিন্তা করো। দুজনেই চুপ হয়ে গেল এখন। আসলে সবাই সবার জন্য চিন্তা করে। কিন্তু চিন্তা করাটা একটা অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাকিবকে দেখে বোঝাই যায় সে এখানে ভালো নেই। জেলখানার পরিবেশটা স্যাঁতস্যাঁতে। রাকিব কথা বলতে গিয়ে কিছুক্ষন পর পর কাঁশি দিচ্ছে। খাবারও অতটা ভালো পাওয়া যায় না।

রাবেয়া নামাজে মোনাজাত করে কান্নাকাটি করে। আল্লাহ্ যেন তাদের সেই পূর্বের সুখের জীবনটা ফিরিয়ে দেয়।

এই সামান্য জীবনে মেয়েটা অনেক কষ্ট করেছে। ছোট বেলায় বিয়ে হয়ে গেল। বাবা-মা মারা গেল। স্বামীও মারা গেল। নিজের আপন বলতে আর কেউ রইল না। রাবেয়া ভাবে, শুধু আপন মানুষগুলোই কেন তার জীবন থেকে বার বার চলে যায়। খোদা কেন এমনটা করে? রাবেয়া আর কোন আপন মানুষকে যে হারাতে চায় না।

রাবেয়ার একমাত্র কাছের মানুষটা হচ্ছে তার ছেলে রাফসান। তাই তার ছেলেকে মাঝে মাঝে আদর করে বলে, তুই আমাকে ছেরে কখনো কোথাও যাস না প্লিজ। রাফসান তার মায়ের কথা শুনে মায়ের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে, কী বলছ এসব মা? তোমাকে ছেরে আমি কোথায় যাবো? কোথায় যাওয়ার কথা বলছ?
রাবেয়া ছেলেকে জরিয়ে ধরে বলে, তুই সবসময় আমার এখানে থাকবি। কোথাও যাওয়া চলবে না। রাফসান মায়ের আঁচল খামচে ধরে বলে, যাবো না মা কোথাও।

আস্তে আস্তে আরো অনেক দিন পার হয়ে গেল। রাবেয়া এখন ভালো আছে। তাই সে ভেবেছে ছেলেকে দিয়ে আর কোন ধরনের কাজ করা চলবে না। সে নিজেই আবার কোথাও কাজ খুঁজবে। এই কয়দিনে ছেলেটার লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তারমধ্যে সামনে পরিক্ষা। কিছুদিন ভালোভাবে পড়াশুনা করুক।
রাবেয়ার আজকে কেন জানি রায়হানের কথা মনে পরছে অনেক। শুধু আজকে না। রাফসান যত বড় হচ্ছে, সে আস্তে আস্তে রায়হানের চেহারা পাচ্ছে। তাই রাবেয়া যখনি তার ছেলের দিকে তাকায়, তখনি রায়হানের কথা মনে পরে যায়।

রাবেয়ার জীবনে আর কোন ধাক্কা আসে নি। ছেলেকে নিয়ে তার জীবনটা অনেক সুন্দর কাঁটছে। রাবেয়া একটা বাসায় কাজ পেয়েছে। এবং মাসের শেষে কিছু টাকা সঞ্চয় করছে। তার ইচ্ছা, সামনের বাজারে একটা দর্জির দোকান দিবে। সেখানে কোনভাবে সাবলম্বী হলে সে আর অন্যের বাসায় কাজ করবে না।
একে একে বছর পার হয়ে যেতে লাগল। রাবেয়ার সঞ্চয় বেড়ে এখন অনেক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই সে বাজারের পাশে একটা ছোট্ট দোকান ভাড়া নিয়ে ফেলল। যথারীতি কাজও শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম লোকজনের পরিচিত হতে অনেকখানি সময় লাগল। একালার মেয়েরা যখন রাবেয়ার প্রতিভা জানতে পারল তখন আর কাস্টোমারের অভাব হল না।

দুই মাসের মধ্যে তাদের ফ্যামিলিটা ঘুড়ে দাঁড়াল। এখন আর খাবারের অভাব হয় না। নিয়মিত বাজার হয়। একদিন রাবেয়া তার শাশুড়ির বাড়িতে গেল। করিমা বেগম তার নাতিকে দেখে অনেক খুশি। তার নাতি এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো কোলে নেওয়া যায় না। করিমা বেগম রাফসানকে দেখে অনেকক্ষন কাঁদলেন।
করিমা বেগম তার ছেলেকে দেখে না অনেক দিন হয়ে গেছে। ছেলের জন্য মনটা তার কেমন জানি করে। ছেলের জন্য চিন্তা করতে করতে সেও অনেকটা অসুস্থ হয়ে গেছে। সেটা তার চোখের নিচের কালো দাগ দেখেই বোঝা যায়। করিমা বেগম রফিক আংকেলের বাসায় কাজ করা অনেক আগেই ছেরে দিয়েছে। কারণ, রফিক আংকেলরা নাকি অনেক আগেই

আমেরিকায় চলে গেছে। সেখানে তার স্ত্রীকে উন্নত চিকিৎসা করাবে।
রাবেয়া ভাবে, ঝুমা আন্টির কথা। উনি অনেক ভালো মানুষ। সেটা তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলো রাবেয়া।

করিমা বেগম এখন অনেকটাই অসুস্থ। তাই রাবেয়া চিন্তা করল, তার শাশুড়িকে আর সে কোন কাজ করতে দিবে না। রাবেয়ার এখন কোনকিছুর অভাব নেই। রাবেয়া তার শাশুড়িকে তাদের বাসায় নিয়ে যাবে এবং সেখানেই তাদের সাথেই থাকবে।
করিমা বেগম প্রথম প্রথম যেতে চাইলো না। কিন্তু রাবেয়া আর রাফসান যেন ছারতেই চাচ্ছে না। রাফসান বার বার বলছে, আমি কখনো ভালোভাবে তোমাকে কাছে পাই নি। তোমার আদর পাই নি। এইবার সেটা মিস হতে দেব না। যে করেই হোক। আমাদের সাথে তোমাকে নিয়েই যাবো।

অবশেষে তিনি রাজি হলেন। তারপর পরদিন তারা আবার বাসায় চলে আসল। তাদের সাথে এখন করিমা বেগমও যাচ্ছেন। সাথে অনেকগুলো ব্যাগপত্র নিয়েছেন। আবার কবে নিজের বাড়িতে আসা হবে সেটা তিনি যানেন না।
রাবেয়ার নিজের বাবার বাড়িতে যেতে ইচ্ছা করছে অনেক। একদিন গেলে ভালো হত। কিন্তু এখন যাবে না। রাকিবকে নিয়ে যাবে। রাকিব তো আর এক বছর পরেই জেল থেকে ছাড়া পাবে। তখন গেলে অনেক ভালো হবে।
রাকিব ছেলেটা ছোট বেলা থেকেই শহরে মানুষ হয়েছে। তাই গ্রামটাকে তেমন করে দেখা হয় নি। তাই ছেলেটা মাঝে মাঝেই রাবেয়াকে নিয়ে গ্রামে যেতে চাইত। কিন্তু সেই ভাগ্যটা আর হয় নি। সেদিন তিনটা গুন্ডা মতোন ছেলে এসে তাদের জীবনটা এক্কেবারে পালটে দিল।

করিমা বেগম এখন তাদের সাথে আছে। অনেক ভালো আছে। এখানে কোন ভারি কাজ করতে হয় না। একটা কর্মঠ মহিলা যদি একটা রুমের মধ্যে আটকে পরে। তবে তার হাত পা কিছু করার জন্য মেচ মেচ করে। তাই এখানে বড় কোন কাজ না করতে পারলেও টুকিটাকি কাজ রাবেয়ার সাথে করে। আবার রাফসানের টিফিন বানিয়ে দেয়। সেই টিফিন নিয়ে রাফসান স্কুলে যায়। বিকালে খেলাধুলা করে। কিন্তু একটা জিনিস ভেবে রাফসানের কষ্ট হয়। তার বন্ধু তারেক এখনো ইট ভাটায় কাজ করে। তার দাদিটাও নাকি এখন অনেক অসুস্থ। হয়তো মরেই যাবে। ছেলেটার দাদি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নাই। তাই স্কুলে আসলে সারাক্ষন মন খারাপ করে থাকে। আগে কত ভালো ছাত্র ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে ছেলেটা লেখাপড়া বাদ দিয়ে দিচ্ছে। এখন আর আগের মতো পড়া শিখে আসে না। রেজাল্টও ভালো হয় না বেশি।
কয়দিন ধরে রাফসান লক্ষ করছে ছেলেটা অনেক দিন ধরে টিফিন আনছে না। রাফসান যখন তারেককে বলল, টিফিন আনিস নি?
তারেক বলে, দাদির অসুখ বেরেছে। বিছানা থেকে উঠতে পারে না। কিছুদিন ধরে হোটেল থেকে খাবার কিনে খেতে হচ্ছে। দাদি রান্না করতে পারছে না। ছেলেটার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে, অনেকগুলো চাপানো বেদনা গলা গিয়ে উতলে বের হচ্ছে।
সেদিন রাফসান আর তারেক টিফিন ভাগ করে খেল। রাফসান বুঝতে পারে তারেকের কষ্টটা।

কয়েক বছর আগে সে নিজেও শুকনো ভাত খেয়ে স্কুলে এসেছে। সে জানে, না খেয়ে থাকতে পারার কষ্টটা। খাওয়া শেষে রাফসান বলে, তুই আর চিন্তা করবি না। কাল থেকে আমি আরো বেশি করে ভাত নিয়ে আসবো। তবে ভুলেও স্কুলে আসা বাদ দিস না। তুই-ই একমাত্র আমার ভালো বন্ধু।

পর দিন থেকে রাফসান তার মাকে বলে, স্কুলের টিফিন আরো বাড়িয়ে দিতে। রাবেয়া কারণ জানতে চাইলে রাফসান তাকে সব কথা খুলে বলে। এবং সাথে এটাও বলে যে, তার দাদি অনেক অসুস্থ। ছেলেটাকে রান্না করে খাওয়ানোর কেউ নেই।
রাবেয়া বলে, তুই চিন্তা করবি না। কালকে থেকে বেশি করে খাবার নিয়ে যাবি। অই ছেলেটা আর ওর দাদিও যাতে খেতে পারে। বুঝেছিস? একটা কথা মনে রাখিস, একদিন আমাদেরও এরকম অবস্থা ছিলো। আমরাও একসময় না খেয়ে দিন পার করেছি। আল্লাহ্ আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। আমাদের ভাগ্য ঘুড়িয়েছেন। তাই আমিও চাই না আমাদের মতো অন্য কেউ না খেয়ে কষ্ট করুক।

পরদিন থেকে রাফসান নিয়মিত তারেকের জন্য খাবার নিয়ে যেতে আরাম্ব করল। দুজনে একসাথে খায়। বিকাল বেলা ছেলেটার সাথে ইট ভাটায় যায়। তারেক কাজ করে। রাফসান মাঝে মাঝে এটা ওটা সাহাজ্য করে আর গল্প করে।এভাবে এক মাস পর তারেক একদিন বলল, "আমার জন্য আর খাবার আনতে হবে না। দাদি মোটামুটি সুস্থ হয়েছে। এখন কোনরকম কাজ করতে পারে।" এবং এটাও বলে, "তোকে আর তোর মাকে অনেক ধন্যবাদ। তুই আমার বিপদে সবসময় পাশে থাকিস। এই ঋণ আমি কখনেই শোধ করতে পারবো না।"
- আরে পাগল। আমি আবার কী করলাম? বন্ধুর জন্য মাঝে মাঝে কিছু একটা আনতে হয়।

এভাবে আস্তে আস্তে আরো একটা বছর পার হয়ে গেল। রাফসান অনেক বড় হয়ে গেছে। ক্লাস ফাইভে পড়ে। দেখতে দেখতে সাতটা বছর পার হয়ে গেল। আজকে রাবেয়ার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন। মনে হচ্ছে, এমন খুশি সে জীবনে কখনো হয় নি।
সকালেই রাবেয়া সুন্দর করে রান্না করল। অনেক আইটেমের খাবার। অনেক দিন পর রাবেয়ার সাজতে ইচ্ছে হল। অনেক্ষন গোছল করল। মাথায় তেল দিল, চুল আঁচড়াল। আলমারি থেকে শাড়ি বের করল।
রাফসানকেও রেডি করে দিল। আজকে বিশেষ একটা দিন। আজকে রাকিব জেল থেকে জামিন পাবে। তাই তারা ৯ টার দিকেই রওনা দিল। সাথে করিমা বেগম। তার চোখে জল। বার বার বোরখার ওরনায় চোখ মুছছে। আজকে তার অনেক কানতে ইচ্ছে করছে। কোন নির্দিষ্ট কারণ নেই। ছেলে তার কোলে ফিরে আসছে, এটাতে তো সে খুশি হবার কথা। হয়তো আনন্দের কান্না এটা।

বেলা এগারোটার দিকে রাকিব ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়ে সে প্রথমে তার মাকে জরিয়ে ধরল। মায়ের চোখেও জল, ছেলের চোখেও জল। রাকিব বলল, আর তোমাকে ছেরে কোথাও যাবো না মা। সারা জীবন তোমার পাশেই থাকব। রাফসানকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, আমাকে মাফ

করে দিও বাবা। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি কান ধরছি। আর কখনো এমন হবে না। এখন থেকে তোমার খেয়াল রাখবো।
রাকিব বাড়ির দিকে রওনা হল। রাকিবের জায়গাটা অচেনা। রাকিব তাদের নিজেদের বাসায় আসলো। তার নিজের বাসাটা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। খুব সুন্দর করে সাজানো। রাবেয়ার দিকে হা করে তাকিয়ে সে বলল, এসব কিভাবে করলে?
- কেন? আমি একা কি কিছুই পারি না?

রাবেয়া রাকিবকে খেতে দিল। সাতটা বছর পর ছেলেটা আজকে পেট ভড়ে খেল। তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলল, জানো। জেলে বসে তোমাদের কতো মিস করেছি। ভেবেছি, কবে ছাড়া পাবো, কবে তোমার আর মায়ের হাতের রান্না খাবো। আজকে আমার সব অপেক্ষার যেন অবসান ঘটল।

রাত ১০ টা বাঁজে। রাফসান আর করিমা বেগম ঘুমিয়ে গেছে। রাবেয়া আর রাকিব আজকে বাসার ছাদে গেছে। চাঁদ দেখবে। রাবেয়া শেষ কবে চাঁদ দেখেছিলো সেটার কথা মনে নেই। আজকে পুর্নিমার রাত। আকাশে যেন একটা হীরার টুকরা জ্বল জ্বল করছে।
রাবেয়া মুচকি মুচকি হেঁসে বলল, জানো! আজকে আমার অনেক খুশির দিন। এত্তো খুশি, ভাষায় প্রকাশ করার মত না।
- আর আমি? আর আমার ভালোবাসার ফুলটা আমার সামনে হাঁসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। এর চাইতে আনন্দের আর কী হতে পারে? জানো! তোমাকে আগের চেয়ে আজকে অনেক বেশি সুন্দর লাগছে।
রাকিব কাছে এসে রাবেয়ার চুলগুলো আলগা করে ছুয়ে দিল। রাবেয়া লজ্জা পেয়ে চলে যেতে চাইলে রাকিব তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে বলে, তুমি এখনো সেই আগের মতোই আছে। মনে করেছিলাম তুমি অনেক বড় হয়ে গেছ। ছেলে বড় হয়ে গেছে। কিন্তু তুমি এখনো সেই ছোটই আছ। লজ্জা পাও খুব।
- কই। আমার অতো লজ্জা নাই।
- সত্যি নাই?
- নাহ।
- প্রমান করো?
রাবেয়া আচমকা রাকিবেকে জরিয়ে ধরে তার ঠোটের উপরে নিজের ঠোট দিয়ে একটা কামড় বসাল। রাকিব এটার জন্য মোটেও প্রস্তত ছিল না। রাকিবের ইচ্ছা হচ্ছে রাবেয়াকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে। আশেপাশের বাসাগুলোতে এখনো আলো জ্বলছে। তার মানে অনেকেই জেগে আছে। পাশ থেকে কেউ দেখে ফেললে বিপদ হবে। কিন্তু রাকিব খেয়াল করছে সে শত চেষ্টা করেও রাবেয়াকে ছাড়তে পারছে না। উলটো সে আরো শক্ত করে চেপে ধরল রাবেয়াকে।
কতক্ষন এভাবে ছিল তার খেয়াল তাদের নেই। রাবেয়া নিজের ঠোট সরিয়ে নিল। সে খেয়াল করল, রাকিবের মুখের একটু অংশ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। কেঁটে গেছে হয়তো। রাবেয়া সেটা দেখে আঁতকে উঠে বলল, অহ.. সরি সরি।
রাকিব ঠোট মুছতে মুছতে বলল, তুমি আগের মতো ছোটোই আছো। চলো কালকে স্কুলে ভর্তি

করিয়ে দেবো।
রাবেয়া বলল, বলেছিলাম না? আমার লজ্জা কম। আর আমি কোন স্কুলে ভর্তি হব না। আমি তোমার ভালোবাসার স্কুলে পড়বো সারাজীবন।

দুজনে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল অনেক্ষন। রাবেয়া বলল, আজকে চাঁদটা এতো সুন্দর হওয়ার কারণ কী?
- জানি না তো।
- চাঁদের আলোর তো কোন পরিবর্তন হয় নি। আগের মতোই আলো দেয়। আসলে, আমরা নিজেরাই মাঝে মাঝে পরিবর্তন হয়ে যাই। রাবেয়া! সারা জীবন এভাবেই তোমার পাশে বসে চাঁদটাকে দেখতে চাই।
- আমিও।
রাকিব বলল, একটা জিনিস তোমার কাছে চাইবো। আমাকে দিবে?
- কী?
- অনেক সুন্দর একটা পরিবার চাই। তুমি পরিবারটাকে আগলে রাখবে ভালোবাসা দিয়ে। পারবে না?
- হুম। তার আগে বলো.. আর কখনো ছেরে যাবে না।
- সারা জীবন তোমার পাশে থাকার চেষ্টা করবো।
- শোনো। আমাদের ছেলেটা বড় ডাক্তার হতে চায়। বুঝেছো? ওকে কিন্তু একটা ডাক্তার বানাবো। ফ্রিতে মানুষের সেবা করবে।
- ভালো কথা। অহ আচ্ছা.. ছেলে তো ডাক্তার হবে। এখন আমাদের যদি আরেকটা মেয়ে হয়, তাহলে অইটাকে কী বানাবে?
- মেয়ে যা হতে চাইবে। তাই হবে। ভালো মানুষ হবে। তোমার মতো।
- মেয়ের নাম কী রাখবে?
- ভেবে তো দেখিনি। যদি ছেলে হয়?
- দুইটা ছেলে। এ তো অনেক ভালো।

দুজন নিরব হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল অনেক্ষন। তারপর রাকিব হঠাৎ করে বলে উঠল, চলো ঘড়ে যাওয়া যাক। বড্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ খোলা রাখতে পারছি না। জেলের মধ্যে ঘুমানো কষ্ট হতো। মশার জ্বালা। কিছুদিন একটু শান্তিতে ঘুমাবো।
- চলো তাহলে। যাওয়া যাক।
রাবেয়া আর রাকিব ছাদ থেকে নেমে আসল।

ছাদের আলোটা এখনো ঝকমক করছে। আজকে রাতটা আসলেই কতো সুন্দর। আকাশে একটু মেঘও নেই। সব মেঘ সরে গিয়ে আকাশটা আজকে পরিস্কার হয়েছে।

৩ মার্চ ২০২৪, শুক্রবার।